ছিন্ন-তার

শ্রীনির্ম্মল দেব

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্
কলিকাতা।

উপহার

ক্ষুধিত

পুরুষের

লুব্ধ পরশে .

যাঁদের জীবন-বীণার

সোণার-তার

ছিঁড়ে গেছে,

আমার

এই

ব্যর্থ-প্রেমের অশ্রু-মালা

তাঁদের গলায়

পরিয়ে

দি

লু

ম

......Wild Oats ! who will reap the harvest ?
A woman of course !......

প্রচ্ছদ-পটটি প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী
চারুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক পরিকল্পিত।

মকর-সংক্রান্তি—১৩৩২

ছিন্ন-তার

"তন্বী সাকীর কটাক্ষেতে বিরল মধুর সাঁঝে—
কিছুই কি নাই? জীবন-সুরা অশ্রু দিয়ে মেশা?"

১

শীতের ছোট বেলা। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। রাম-বাগানের একটা বড় বাড়ীর তেতলার ছাদের এক নিরিবিলি ঘরে এলাইয়া পড়িয়া সায়াহ্নের ম্লানায়মান আলোকে নীরজা নিবিষ্টচিত্তে একখানা নভেল্ পড়িতেছিল। সহসা দমকা হাওয়ার মত ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া নীরজার মা মানদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"হ্যাঁরে নীরি, কী বেআক্কেলে মেয়ে তুই বল্ দিকিন্! নিজের ভালো-মন্দ কি তুই কোনোদিন বুঝ্‌বি না! আজ সকাল থেকে ব'লছি বেলা থাক্‌তে-থাক্‌তে চুল বেঁধে কাপড় কেচে তৈরী হ'য়ে নিতে, সন্ধ্যাবেলা বিজয়বাবু আস্‌বে, তা

কোনো গেরাহ্যি নেই! বিজয়বাবু কি এসে তোর জন্মে হাঁ ক'রে ব'সে থাক্‌বে! অতো গুমর্ দেখ্‌লে মুখে নাতি মেরে অন্য মেয়েমানুষের কাছে চ'লে যাবে।"

মাথা হইতে একটা কাঁটা খুলিয়া বইয়ের পড়া পাতার মধ্যে গুঁজিয়া নীরজা উঠিয়া বসিয়া আবিষ্টার মত মা'র মুখের পানে চাহিয়া রহিল, কোনো উত্তর্ দিল না।

নীরজার মা বলিল—"হাঁ ক'রে চেয়ে আছিস্ কি! ওঠ্, চুলটা বেধে শীগ্‌গীর্ কাপড়টা কেচে আয়। সন্ধ্যা হ'তে কি আর দেরী আছে, এখনই বিজয়বাবু এসে প'ড়্‌বে!"

কিন্তু নীরজার উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। দু'টি কালো চোখের সকরুণ দৃষ্টি মেলিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে সে বলিল—"এ-জীবন যে আমার একটুও ভালো লাগে না মা!"

নীরজার এ কাতর আবেদন মানদার কঠিন হৃদয়খানাকে আদৌ স্পর্শ করিল না। নির্ব্বিকারচিত্তে সে বলিল—"ভালো লাগে না ব'ললে কি চলে, ভালো লাগাতে হবে। সতেরো বছর বয়স হ'লো, এখনো যদি ভালো না লাগে তো কবে আর লাগ্‌বে! ভালো লাগে না, ভালো লাগে না—এ তো চিরকালই শুনে আসছি!"

নীরজা স্মৃতির আগল্ খুলিয়া ফিরিয়া চাহিল—তাহার এই সতেরোটা বছরের হারানো অতীতের পানে।—বালিকা-বয়সে বোর্ডিংএ থাকিয়া সে লেখাপড়া করিত। কী সুখেরই ছিল সে নিশ্চিন্ত-নিরুদ্বিগ্ন দিনগুলি! ছাত্রী-জীবনের সেই স্বচ্ছ-অনাবিল আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে তখন সে স্বপ্নেও কখনো ধারণা করিতে পারিত না যে, তাহার নারী-জীবনের সেই সূক্ষ্ম-সরল ধারাটি একদিন উল্কার মত সীমাহারা দিশাহারা অন্ধকারের ভিতর দিয়া এমন করিয়া নিরুদ্দেশের পথ বাহিয়া চলিবে। তখন ভবিষ্যৎ-জীবনের একটা শান্ত-মধুর ছবি তাহার বাল্যের কল্পনাকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। তা'রপর একদিন চৌদ্দ-বছর বয়সে যৌবনের সোণার-কাঠির পরশে যখন তাহার দেহকুঞ্জের সবুজ শাখা ফুলে-ফুলে ভরিয়া উঠিল, তখন তাহার শুভানুধ্যায়িনী জননী স্কুল্ হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া আনিয়া তাহার এই কেন্দ্রচ্যুত জীবনের হাতেখড়ি করাইয়া দিলেন। উঃ! সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়িলে আজও লজ্জায় ঘৃণায় তাহার পোড়া মুখটাকে মাটির নীচে লুকাইতে ইচ্ছা করে!—এক অগাধ-অর্থশালী মাড়োয়ারীর পায়ে তাহার দেহ বিকাইয়া দিবার জন্য সারাদিন ধরিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা, অজস্র অনুরোধ

ছিন্ন-তার

উপরোধের পর সন্ধ্যাবেলা তাহার মা হাল ছাড়িয়া দিবার ভাণ করিলেন, সেও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে করিল—সে বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। তা'রপর রাত্রে যখন সে নিশ্চিন্ত-চিত্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন তাহার মা সেই ধনী মাড়োয়ারীকে তাহার ঘরে আনিয়া তাহার নিদ্রিত .....! এক অপূর্ব্ব শিহরণে যখন সে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল—তাহার নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন সে চিরদিনের জন্য হারাইয়াছে! সেই-দিন হইতে এই দীর্ঘ তিন্‌টা বৎসর ধরিয়া কত লম্পট ধনীর লালসা-লোলুপ দৃষ্টির তলে তাহার নারীত্ব অহরহ অবমানিত হইয়াছে, কত কামোন্মত্ত যুবকের ব্যগ্র আলিঙ্গনে তাহার এই তরুণ দেহ অশুচি হইয়া উঠিয়াছে, কত লুব্ধ পুরুষের উত্তপ্ত চুম্বনে তাহার ঠোঁট-তু'খানা জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে! পলাইয়া বাঁচিতে সে চাহিয়াছে, কিন্তু পলাইয়া সে যাইবে কোথায়, পলাইবার স্থানই বা তাহার কোন্‌খানে! সংসারে তাহার একটিমাত্র অবলম্বন—ওই মা। সেই মা-ই তো তাহার নারীত্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া রাস্তার ধূলা-কাদার সহিত মিশাইয়া দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়াছে এই হাহাকারের পথে! কেহ তো নাই এজগতে, যে তাহার প্রতি করুণা করিয়া একখানি স্নেহ-

ব্যাকুল হাত মেলিয়া এই চোরাবালি হইতে তাহাকে টানিয়া তুলিবে! তাহার কালো আঁখি-দু'টি সজল হইয়া আসিল।

মানদা হুঙ্কার ছাড়িল—"কি, কথা কাণে যাচ্ছে, না, না? ভালো কথায় যদি না ওঠো, তা'-হ'লে কি খোয়ার হবে তা' জানো! সেদিনকার কথা মনে আছে ত!"

একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাহার এই দুর্ভাগ্য-নিরুপায় জীবনটাকে মনে-মনে শত ধিক্কার দিয়া নীরজা বইখানা হাতে লইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

চুল বাঁধিয়া, কাপড় কাচিয়া, প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া নীরজা তাহার বসিবার-ঘরে প্রবেশ করিয়া, আলোর সুইচ্‌টা টানিয়া দিয়া বড় আর্‌সীখানার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সতেরোটি-বসন্তের-আল্‌পনা-আঁকা যৌবনভারাবনত দেহখানি স্বচ্ছ আর্‌সীর মধ্যে অন্ধকার আকাশে শুকতারার মত ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। সেই উচ্ছলিত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা-বিহ্বল নয়নে খানিকক্ষণ সে নিজেরই প্রতিবিম্বের পানে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল—ওই-যে প্রভাত-কমলের মত শুভ্র-সুন্দর দেহখানি, চিরটাকাল দুর্গন্ধ পাঁকের মধ্যেই উহা পড়িয়া থাকিবে,—না লাগিবে পূজায়, না সাজিবে

উৎসবে! ফুটিয়াছে সে লালসার বিলাস-কুঞ্জে—কেবলমাত্র দিনের-পর-দিন একটা স্থূল ভোগের উষ্ণ নিশ্বাসে ঝলসিয়া উঠিবার জন্য! নিজের ছায়ার পানে চাহিয়া করুণা-বিগলিত কণ্ঠে সে মনে-মনে বলিল—হারে! অভাগিনী, কেন ফুটেছিলি! কুঁড়িতেই ঝ'রে গেলি না কেন!......

নীরজার এ মুগ্ধ স্বপ্নাবেশকে একটা নিদারুণ ধাক্কা দিয়া নীচে এক পরিচিত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল,—নীরজা বুঝিল বিজয় আসিতেছে! মুহূর্ত্তের জন্য লজ্জায়-ঘৃণায় তাহার মনটা তিক্ত-বিরস হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই, বধাভূমিতে দাঁড়াইয়া ফাঁসির আসামী যেমন করিয়া নির্ব্বিকার-উদাস ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে, ঠিক তেমন করিয়া অন্তরের সমস্ত সুখ-দুঃখকে সরাইয়া দিয়া নীরজা শূন্য-উদাস হৃদয়ে বিজয়ের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

মানদা বিজয়কে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেল। ঘরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে নীরজাকে দেখিয়া মুচকিয়া হাসিয়া মাতালের-মত-জড়িত-কণ্ঠে বিজয় বলিল—"গুড্ ইভ্নিং নীরজা-বিবি!"

নীরজা কলের মত হাত-দু'টিকে কপালে উঠাইয়া একটা

নমস্কার করিয়া বিজয়ের ফাঁকা অভিবাদনের উত্তর করিল।

পূর্ব্বে যে-কয়েকবার বিজয় এ-ঘরে পায়ের ধূলা দিয়াছিল, সে-কয়েকবার সে একলাই আসিয়াছিল। কিন্তু নীরজা দেখিল আজ তাহার পিছনে-পিছনে অপর একটি যুবক প্রবেশ করিল। এই নূতন আগন্তুকের মুখের পানে চাহিতেই মুহূর্ত্তের জন্য দুই-জনের চোখোচোখি হইয়া গেল, লজ্জায় নীরজা দৃষ্টি নত করিল।

দুই-জনে ঘরে প্রবেশ করিয়া বিছানায় বসিলে নীরজা দুয়ারের পরদাটা টানিয়া দিয়া তাহাদের সম্মুখে একটু দূরে গিয়া বসিল।

সঙ্গীটিকে নির্দ্দেশ করিয়া বিজয় নীরজাকে বলিল—"এটি আমার প্রাণের বন্ধু অলোক। এর বেশী কিছু পরিচয় দেবার সামর্থ্য আমার নেই, যদি জহুরী হও তা'-হ'লে এ মাণিকটিকে চিনবে।" এই বলিয়া বিজয় খানিকটা হাসিল।

নীরজা চকিতে অলোককে একবার দেখিয়া লইল। মনে-মনে বলিল—বেশ্যাসক্ত মাতালের প্রাণের বন্ধু যে কেমন মাণিক হইবে তা' চিনিতে তাহার বাকী নাই, এই তিনটা বৎসর ধরিয়া এমনি কত মাণিকই সে চিনিল!

ছিন্ন-তার

একটা ছোট চামড়ার-বাক্স বিজয় সঙ্গে আনিয়াছিল। সেটি খুলিয়া সে একটা মদের বোতল বাহির করিল। গ্লাসের জন্য এদিক-ওদিকে চাহিতেই দরজার বাহিরে মানদার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল—"নীরি, আমার ঘরে কাঁচের গেলাস্ আছে, দরকার হয় তো নিয়ে যাস্।"

মানদার কথা শুনিয়া অলোক আপনমনে বলিয়া উঠিল—"মাগী কি নির্লজ্জ, অসভ্য! মেয়ের কাছে কোথাকার কে-একটা লোক এসে ব'সেছে—ফূর্ত্তি-ইয়ারকি করবার জন্যে, মাগী পরদার ফাঁক দিয়ে কিনা তা'ই দিব্যি অসঙ্কোচে চেয়ে-চেয়ে দেখ্‌ছে! কী দিয়ে যে বিধাতা এদের গ'ড়েছিল!" তা'রপর নীরজার দিকে চাহিয়া বেশ একটুখানি শ্লেষ মিশাইয়া বলিল—"ওঠ গো রূপসী, যাও, তোমার বাবু মদ খাবে, মা'র ঘর থেকে গেলাস্‌টা নিয়ে এস!"

অলোকের তীক্ষ্ণ শাণিত কথাগুলা নীরজার বুকখানাকে যেন করাত দিয়া চিরিয়া দিল। কি-এক অজানা অভিমানে তাহার চোখ-দুইটা ছলছল্ করিয়া উঠিল। সে কিছুই উত্তর দিল না, নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া মা'র ঘর হইতে দুইটা ভাল কাঁচের গ্লাস্ আনিয়া বিজয় ও অলোকের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

অলোক বুঝিল দুইটা গ্লাসের অর্থ কি। সে 'ধন্যবাদ!' বলিয়া একটা গ্লাস্ লইয়া দূরে সরাইয়া রাখিল।

বিজয় বোতলটা খুলিয়া গ্লাসে মদ্ ও সোডা ঢালিয়া গ্লাস্‌টা নীরজার দিকে আগাইয়া দিয়া একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল—"দাও দেবী, ভক্তদের প্রসাদ ক'রে!"

নীরজা লজ্জায় মরিয়া গিয়া হাত-দুইটি জোড়্ করিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে, বলিল—"আমায় মাপ করুন, আমি জীবনে কোনোদিন ও স্পর্শ ক'রিনি।" নীরজা আর চাপিতে পারিল না, একটা নিবিড় ব্যাথায় তাহার গলা ভারী হইয়া আসিল, অবরুদ্ধ অশ্রুর ভারে তাহার ত্রস্ত আঁখি-দু'টি ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল।

অলোক মুহূর্ত্তের জন্য নীরজার সজল মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। তা'রপর একটি কথা না বলিয়া, বিজয়ের হাত হইতে মদের গ্লাস্‌টা লইয়া উঠিয়া ঘরের বাহিরে রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়া মদ-সমেত গ্লাস্‌টা উপর হইতে নীচে ফেলিয়া দিল, গ্লাস্‌টা সশব্দে চূরমার হইয়া গেল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া যেন-কিছুই-হয়-নাই এম্‌নি সহজভাবে নির্ব্বিকার-কণ্ঠে অলোক নীরজাকে বলিল—"তোমার গেলাস্‌টা ভেঙ্গে ফেল্‌লুম্, দুঃখু কোরো না, কাল তোমায় একটা নতুন গেলাস্ কিনে এনে দোবো।"

নীরজা কোনো উত্তর দিল না, অবাক হইয়া অলোকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বিজয়ের কাছে অলোকের এরূপ উদ্ভট খেয়াল কিছুই নূতন নয়; সে বলিল—"ব্যাপারটা কি হ'লো?"

অলোক হাসিয়া বলিল—"গেলাস্‌টা নীচে ঠেকে কেমন একটা মিষ্টি হাল্‌কা আওয়াজ হ'লো, শুন্‌তে বেশ লাগ্‌লো না?"

বিজয় বলিল—"হঠাৎ আজ তোমার মদে অরুচি, এর অর্থ কি?"

অলোক তেম্‌নি হাসিয়া বলিল—"অর্থ এই যে, মাঝে-মাঝে এম্‌নি অরুচি হয় ব'লেই নির্ভয়ে মদ খেতে পারি; যেদিন এই অরুচি ঘুচে যাবে, সেদিন মদকেও "গুডবাই" ক'রবো।"

বিজয় বলিল—"না, ওসব চালাকি চ'লবে না। একটু পেটে না প'ড়লে কি আর ওম্‌নি ফূর্ত্তি হবে!" এই বলিয়া বিজয় বোতলের ছিপিটা খুলিতে গেল।

অলোক ডান হাত দিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল—"ওটা ওই বাক্সর মধ্যে পূরে ফ্যালো। আমি ব'লছি আজ ওটার মধ্যে কোনো আনন্দই পাবে না, অনর্থক আপ্‌শোষে মনটা ভ'রে উঠ্‌বে।"

বিজয়ের মনে হইল—সত্যই আজ প্রথম হইতেই সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন বেজায় বেসুরা-গোছের লাগিতেছে, এ-অবস্থায় মদের ফূর্ত্তি মোটেই জমিবে না। বার তিন-চার হইল সে এই মেয়েটির ঘরে আসিয়াছে। কিন্তু প্রথম হইতেই ইহার প্রত্যেক আচরণে কেমন-যেন-একটা আল্‌গোচা-ভাব সে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে। ঠিক যে-জিনিষটির জন্য ঘরে সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ কুৎসিতা অশিক্ষিতা বারাঙ্গনার কাছে লুব্ধ-হৃদয়ে ছুটিয়া আসে, সে-জিনিষটির কণামাত্রও ইহার কাছ হইতে কোনোদিন সে পায় নাই। একটা সুস্পষ্ট দূরত্বের গণ্ডী টানিয়া প্রথম হইতেই সে কেমন-যেন আড়ালে-আড়ালে থাকে, তাহাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। ইহার ওঠা, বসা, চলা, ফেরা, কথা কওয়া, সমস্তই যেন কলের মত—ইহাদের পিছনে ইহার নিজের কোনো অনুভূতি নাই। যেন কোন্‌-একটা স্বতন্ত্র ইচ্ছা আড়ালে বসিয়া তার টানিয়া ইহাকে চলাইতেছে ফিরাইতেছে।—কেবল, একটু পূর্ব্বে যে কয়-ফোঁটা অশ্রু তাহার চোখ-দু'টি হইতে আচম্‌কা ঝরিয়া পড়িয়াছিল, সেইটুকুই যেন তাহার নিজের, সেখানে আর-কাহারও হাত নাই!

বিজয়ের বিশ্বাস ছিল—দু'-চার দিন আনাগোনা করিলেই

এবং কিছু টাকা ছাড়িলেই প্রথম-পরিচয়ের কুণ্ঠা ঘুচিয়া গিয়া নীরজার এ আল্‌গোচা-ভাব কাটিয়া যাইবে। কিন্তু আজ তাহার মনে হইল—সে আশা দুরাশা মাত্র, সাধারণ বেশ্যা-জাতির বেলায় যে-আইন খাটে, সে-আইন ইহার বেলায় আদৌ খাটিবে না,—এ যেন একটা সৃষ্টিছাড়া মানুষ!

এই ভাবিয়া অলোকের পরামর্শ মানিয়া লইয়া বিজয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মদের বোতলটি আস্তে-আস্তে সেই বাক্সর মধ্যে পূরিয়া ফেলিল।

বিজয় একটু বিমর্ষভাবে মুখ ফিরাইয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। নীরজাও নীরব ছিল। কেমন-যেন-একটা থম্‌থমে নিস্তব্ধতা ঘরখানাকে ভরিয়া তুলিল।

অলোক নীরজাকে বলিল—"এরকম নিঝুমের পালা আমার পোষায় না। ওঠ তো নীরা রাণী, একখানি গান গেয়ে এই ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে-চুরে দাও তো!"

এতক্ষণের রুক্ষ অবজ্ঞার পরিবর্ত্তে হঠাৎ আলোকের এই স্নিগ্ধ-সস্নেহ আহ্বানে নীরজা চমকিয়া উঠিল, তাহার সন্দেহ হইল সে ঠিক শুনিয়াছে কি না।

ক্ষণেকের তরে অলোকের মুখের উপরে একটা সকৃতজ্ঞ

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীরজা উঠিল,—এতক্ষণে যেন তা'র অচেতন দেহের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইল ; তাহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন এতক্ষণ সে ঘুমাইতেছিল, এইবার চোখ মেলিয়া জাগিয়া উঠিল।

নীরজা উঠিয়া আস্তে-আস্তে অর্গ্যানের কাছে গেল। মুহূর্ত্তকাল মনে-মনে কি ভাবিয়া লইয়া অর্গ্যান্‌টা খুলিয়া গান ধরিল—

"সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে,
দিবস গেলে
ক'রবো নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন—"

প্রাণ দিয়া মন দিয়া নীরজা পদের পর পদ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গাহিয়া চলিল। এই হতভাগিনীর আশাহত প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে যেন কতদিনের কত পুঞ্জীভূত অশ্রু আজ এই করুণ সুরের ভিতর দিয়া ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অলোক দেওয়ালে ঠেসান দিয়া, পা-দুইটা ছড়াইয়া কোলের উপরে একটা তাকিয়া লইয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে গান শুনিতে লাগিল। তাহার বোধ হইল যেন নীরজার কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইতেছে কোনো সুর

নয়, কোনো গান নয়,—এক আর্ত্ত নারীর দীর্ণ হিয়ার কাতর ক্রন্দন! যেন এক বন্দী পাখী নীল আকাশের পানে লোলুপ-নয়নে চাহিয়া-চাহিয়া ডানা আছ্ড়াইয়া ডাকিতেছে—'ওগো খুলে দাও এ খাঁচার দুয়ার—'ওগো খুলে দাও!

গান থামিয়া গেল, কিন্তু সে ব্যথার রেশটুকু অলোকের চিত্তদ্বারে তখনও পর্য্যন্ত কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে ঠিক তেম্নি ভাবে দেওয়ালে ঠেসান দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

খানিক পরে হাসিয়া বিজয় বলিল—"কেমন লাগ্‌লো অলোক?"

অলোক বলিল—"কেমন লাগ্‌লো ঠিক ব'লতে পারি না, তবে এইটুকু নিঃসন্দেহে ব'লতে পারি যে, এমন লাগা কোনো জিনিষ কোনো দিন আমার লাগেনি! আজ আমার মনে হচ্ছে যথার্থ গান জিনিষটা যেন কান্নারই প্রতিধ্বনি, যে কাঁদ্‌তে জানে না, সে বোধ হয় গাইতেও পারে না।"

অলোকের কথার প্রত্যেক অক্ষরটি নীরজা প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় দুই কাণ দিয়া গ্রহণ করিল। সে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল—

তাহার বুকের গোপন পুরীর সন্ধান এই অপরিচিত মানুষটি কি করিয়া পাইল !

অলোক বলিল—"আর না বিজয়, এইবার ওঠো।"

বিজয় বলিল—"আরে আর-একটু ব'স, আর দু'-চার খানা গান শুনে যাও !"

অলোক বলিল—"না, আর ব'সবো না, পরিপূর্ণ সুখের চেয়ে অপরিপূর্ণ সুখের দাম ঢের বেশী ! তোমার ব'সতে ইচ্ছা হয় ব'স, আমি উঠ্‌লুম্।"

এই বলিয়া অলোক যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিজয়ও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এক যাত্রায় পৃথক ফল তো হ'তে পারে না, কাজেই আমায়ও উঠ্‌তে হ'লো।"

হঠাৎ কি মনে করিয়া অলোক নীরজার দিকে আগাইয়া গিয়া দুই-হাতে তাহার হাত-দুইখানি ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া সস্মিতমুখে বলিল—"আসি ভাই নীরা, বড় চমৎকার লাগ্‌লো আজকের সন্ধ্যাটা !"

অলোকের এই উচ্ছ্বাস এতই অতর্কিত যে নীরজা ঠিক করিতে পারিল না সে কি বলিবে বা কি করিবে। কিন্তু সে নিতান্ত অবাক হইয়া গেল যে, অলোকের এই উচ্ছ্বসিত স্পর্শের মধ্যে একটুও

স্পন্দন নাই, এতটুকুও আবেশ নাই। একটি তেইশ-বছর বয়সের তরুণ যুবক এক সতেরো-বছরের পরিপূর্ণ-যৌবনা তরুণীর হাত-দুইখানা এমন করিয়া ধরিল, অথচ তাহার সে হাত-দুইখানা একটা পুলকিত আবেশে একটুও কাঁপিয়া উঠিল না, শরীরের রক্ত-প্রবাহ একটুও দ্রুত হইল না! নীরজার মনে হইল—আজ তাহার হাত না ধরিয়া অলোক যদি একটা আশী-বছরের বুড়ার হাত ধরিত, তবে ঠিক এমনি করিয়াই ধরিত, কোনো পার্থক্য তাহার মধ্যে থাকিত না।

নীরজার ঘর হইতে বাহির হইয়া অলোক ও বিজয় বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই মানদা আসিয়া বিজয়কে বলিল—"আবার কবে পায়ের-ধূলো দিচ্ছেন বলুন্ বিজয়বাবু। মেয়েটা একটু লাজুক, দু'-চারদিন এলে-গেলেই লজ্জা কেটে যাবে!"

বিজয় কিছু বলিল না। কিন্তু অলোক মানদাকে বলিল—"আচ্ছা হ্যাঁগা, ওটি কি সত্যিই তোমার নিজের মেয়ে?"

অলোকের এই অনাবৃত প্রশ্নে মানদার হাড় জ্বলিয়া গেল। কোথাকার কে-একটা মোসাহেব জুটিয়া আজ গোড়া হইতেই কেবলই খোঁচা মারিয়া কথা কহিতেছে। তাহার একবার মনে হইল মুখ ছাড়িয়া ছোঁড়াটাকে বেশ আচ্ছা করিয়া দু'-কথা

শুনাইয়া দেয়। কিন্তু পাছে বিজয় বিগ্‌ড়াইয়া গিয়া হাতছাড়া হইয়া যায়, এই ভয়ে সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল। অলোকের প্রশ্নের উত্তরে সে কিঞ্চিৎ ঝাঁজের সহিত, কিন্তু মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"কেন বলুন্ তো, আপনার এ সন্দেহের কারণ কি?"

অলোক তেম্‌নি অসঙ্কোচে বলিল—"ও না-না, ভুল ক'রেছি, পাঁক থেকেই যে পদ্মের জন্ম!"

এই বলিয়া অলোক আর কোনো কথা না কহিয়া, মানদার দিকে না চাহিয়া, বিজয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, এবং মানদা দাঁড়াইয়া রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতে লাগিল।

২

অলোক-বিজয় চলিয়া গেলে নীরজা পাথরের মূর্ত্তির মত খানিকক্ষণ নিশ্চল-নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। কত অচিন্ত্য-পূর্ব্ব কথা তাহার বিক্ষুব্ধ মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে লাগিল।

মানদা ঘরে ঢুকিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"ছাখ্ নীরি,

হাতের লক্ষ্মীকে যে পায়ে ঠ্যালে, তা'র কপালে অনেক দুঃখু লেখা আছে। ওই-যে বাপু একটা বড়লোকের ছেলে এলো তোর কাছে, তা একটু কাছে গিয়ে ব'সলে কি তোর গাটা ক্ষ'য়ে যেতো! তা' নয়-তো উনি লজ্জাশীলার মতন লজ্জায় ম'রে গিয়ে যেন ঘোম্‌টা দিয়ে ব'সে রইলেন!"

নীরজা ঠিক তেম্‌নি-ভাবেই বসিয়া রহিল, মানদার এই কথামৃতের একটা অক্ষরও যে তাহার কাণে ঢুকিয়াছে, তাহার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

মানদা বলিতে লাগিল—"আর কোত্থেকে আজ একটা হতভাগা, মুখপোড়া ছোঁড়া এসে জুটেছিল, ওই ড্যাক্‌রাটাই তো আজ সব মাটি করে দিলে, না-হ'লে কি বিজয়বাবু এত শীগ্‌গীর্‌ ওঠে! পোড়ারমুখো আবার যদি এ-বাড়ীর চৌকাট মাড়ায়, তো মুড়ো ঝ্যাঁটা ওই মুখের ওপর সপাসপ্‌ বসিয়ে দোবো!"

নীরজা এতক্ষণে কথা কহিল। সে বলিল—"কেন মা সে ভদ্দর-লোককে মিছিমিছি অমন ক'রে গালাগাল দিচ্ছো! কি অন্যায় ক'রেছেন তিনি!"

মানদা হাত-দুইখানা নাড়িয়া চোখ ঘুরাইয়া এক বিকট

অঙ্গভঙ্গী করিয়া বলিল—"দেখিস্ লো, দরদ যে একেবারে উথ্‌লে উঠ্‌ছে, তবু যদি ছোঁড়ার পয়সা থাক্‌তো!"

এই বলিয়া মানদা অঙ্গ দোলাইয়া অবজ্ঞাভরে চলিয়া গেল। নীরজা কিছু না বলিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

খানিক পরে মানদা আবার প্রবেশ করিয়া বলিল—"কি গিল্‌তে হবে, না, গালে হাত দিয়ে ব'সে থাক্‌লেই পেট্‌টা ভ'রবে?"

নীরজা নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

* * * * *

স্তব্ধ-গভীর রাত্রি! নীরজা ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল—কোথায় কোন্ সে অজানা দেশ! নীরজা চলিয়াছে এক অচেনা পথ বাহিয়া—নিঃসঙ্গ, একেলা! চতুর্দ্দিকে নিবিড়-কালো অন্ধকার নাগপাশের মত তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, সম্মুখে-পিছনে কোথাও একটুখানিও ক্ষীণ আলোর রেখা নাই—যাহাকে লক্ষ্য করিয়া সে চলিতে পারে। কাঁটাভরা পথ, অন্ধকারে চলিতে-চলিতে সে কতবার পড়িতেছে, উঠিতেছে; তাহার শ্রান্ত

দেহ কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছে। কেহই নাই—সে-অন্ধকারে একখানি করুণা-কোমল হাত বাড়াইয়া তাহার আহত-আর্ত্ত হৃদয়খানিকে একটুখানি আশ্রয় দেয়!......আর সে চলিতে পারিল না, শোণিতাক্ত দেহ তাহার অবশ হইয়া আসিল। ক্লান্ত হৃদয় ও শ্রান্ত শরীরে পথের ধূলার উপর বসিয়া পড়িয়া সেই নিকষ-ঘন অন্ধকারের মধ্যে তাহার অলক্ষ্য-দেবতার পানে দু'খানি ভয়ার্ত্ত বাহু প্রসারিত করিয়া সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—ওগো, আর পারি না, মুক্তি দাও! সহসা দূরে—অতি দূরে—সেই কালো অন্ধকার ফিকে হইয়া গিয়া নিশীথ-আকাশের নিরালা প্রান্তে একটা রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল। সেই রক্ত-রাগের ভিতর হইতে যেন একটা স্নেহ-কম্পিত বাণী জাগিয়া উঠিল—এস নীরা—আমার কাছে! নীরজা চমকিয়া উঠিল,—এ কাহার কণ্ঠস্বর! এ স্বর তো তাহার অপরিচিত নয়! সে কাণ খাড়া করিয়া বসিয়া রহিল। আবার সেই সস্নেহ আহ্বান—এস নীরা, চ'লে এস! নীরজা লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিল—ব্যগ্র-ব্যাকুল চরণে, সেই দূরে আলোর সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া; আর্ত্ত প্রাণ তাহার সাড়া দিল—যাচ্ছি! যাচ্ছি! ওগো একটুখানি দাঁড়াও! নীরজা উন্মাদিনীর মত অধীর আগ্রহে ছুটিতে লাগিল,—

ওই !—ওই !—ওই আলোর মাঝে হাস্য-রঞ্জিত-মুখে দাঁড়াইয়া—দেবতার মূর্ত্তিমান আশীর্ব্বাদের মত—তিনি !

নীরজার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নের উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীরটা তখনও থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, সে উঠিয়া সুইচ্‌টা টিপিয়া আলোটা জ্বালিল। নীরজা দেখিল—ঠিক তাহার পাশেই তাহার মা নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন। নীরজা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাহার মা'র ঘুমন্ত মুর্ত্তিটার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল—ওই তাহার মা! যিনি দশমাস দশদিন ধরিয়া বক্ষের বিন্দু-বিন্দু শোণিত দিয়া জীবের দেহ গড়িয়া তোলেন, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত স্নেহ চয়ন করিয়া আনিয়া দেবতার বরের মত সন্তানের শিরে বর্ষণ করেন, যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের অন্তরের স্নেহ-দয়া-মায়া-প্রেম গন্ধে-বরণে বিকশিত হইয়া ওঠে,—সেই মা তাহার ওই ওখানে শুইয়া ঘুমাইতেছেন! আজিকার ওই পাষাণ হিয়ার শুষ্ক মরু মাতৃ-স্নেহের সুধারসে কোনোদিন সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল কি! কে জানে ওই বুকখানার মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের কণাটুকুও আজ বাঁচিয়া আছে কি না, কে বলিতে পারে ওই দেহখানার মধ্যে একটা রাক্ষসী ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুর সাড়া পাওয়া যায়!

এ চিন্তা নীরজার মনের মধ্যে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। এই শীতের রাত্রেও ঘরের মধ্যে তাহার অসহ্য গরম বোধ হইতে লাগিল। ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সে খোলা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি মেলিয়া সে দেখিল—অন্ধকার আকাশের বুকে অযুত গ্রহ-তারকা ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। অনেকক্ষণ নির্ণিমেষ-নয়নে সে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—ওই নিদ্রাহারা তারাগুলা বোধ হয় তাহারই মত আঁধারের যাত্রী, স্তব্ধ-নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দিয়া তাহারা চলিয়াছে—তাহারই মত একটুখানি আলোর কাঙ্গালিনী! চাহিয়া আছে তাহারা পিয়াসী নয়ন মেলিয়া দূরে পূব-আকাশের পানে—কবে কখন ভোরের অরুণ-রাগে নিজেদের ডুবাইয়া দিয়া সারা-রাত্রি-জাগা জীবনের সকল ব্যর্থতাকে তাহারা সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে!

নীরজা অন্যমনস্কভাবে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া তেতলার ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। নীরব-নিথর রাত্রে, চতুর্দ্দিকের সুপ্তির মাঝে মুক্ত-উদার আকাশের তলে দাঁড়াইয়া তাহার বেশ-একটা শান্তি বোধ হইতে লাগিল। আলিসার উপরে আসিয়া সে বসিল। গলির ওপারের বাড়ীখানার সাম্‌নের ঘরের

জানালা খোলা ছিল। নীরজা দেখিল অত রাত্রেও সে-ঘরে পূরাদমে ফূর্ত্তি চলিতেছে,—তাহারই বয়সী একটি তরুণী ঘুমুর পরিয়া শিথিল অঙ্গ দোলাইয়া লীলাভরে নৃত্য করিতেছে, তাহার মুখে-চোখে মদ্যপানের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। তাহাকে ঘিরিয়া একদল মাতাল জড়িত-কণ্ঠে মধ্যে-মধ্যে বিকট চীৎকার করিয়া তাহার নৃত্যকলার তারিফ্ করিতেছে। ঘৃণায় বিকারে নীরজার মনটা ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল—ওই-যে মেয়েটা তাহার যৌবন-দীপ্ত দেহখানাকে অর্দ্ধ-অনাবৃত করিয়া অতগুলা লুব্ধ পুরুষের ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখে অমন অসঙ্কোচে মেলিয়া ধরিয়াছে, যতদিন ওই রূপ-যৌবন উহার শরীরের উপরে ফুলের মত ফুটিয়া থাকিবে, ততদিন উহাকে ঘিরিয়া কত বিনিদ্র রজনীর অশ্রান্ত উৎসব অমন্ করিয়া জমিয়া উঠিবে, কত কপট প্রেমের মিথ্যা গুঞ্জন উহার দুই কাণে অবিরত ধ্বনিত হইবে, উহার একটুখানি অনুগ্রহ-দৃষ্টির জন্য কত পুরুষ কত সাধ্য-সাধনা করিবে। তা'রপর একদিন যখন তাহার ওই দু'দিনের রূপ-যৌবনের পাপ্‌ড়ি ধীরে-ধীরে ঝরিয়া যাইবে, শুষ্ক ফুলের মত তাহার জরাগ্রস্ত শীর্ণ-ম্লান দেহটার মধ্যে কোনো গন্ধ, কোনো বর্ণ, কোনো মধু থাকিবে না, তখন আজিকার ওই মুগ্ধ-বিহ্বল স্তাবকের দল অবজ্ঞায়

অশ্রদ্ধায় দু'পায়ে মাড়াইয়া উহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। তখন সেই যৌবন-সন্ধ্যায় তাহার এই ঘৃণিত জীবনের বিরাট শূন্যতা তাহার সম্মুখে আসিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইবে,—তখন আরম্ভ হইবে তাহার জীবন-জোড়া দাহ ও জ্বালা! তখন সে দাঁড়াইবে কোথায়!—ধরিবে কাহাকে!—পাইবে কি!

নীরজার মনে হইল তাহার এই লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের পরিণামও তো ঠিক এই!—দুর্গন্ধ পাপের-পঙ্কে আজীবন ডুবিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক্ হইয়া অবশেষে একদিন তাহার এই ব্যর্থ-নিষ্ফল নারী-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে! কেহ তাহার জন্য শোক করিবে না, কেহ তাহার জন্য অশ্রু ফেলিবে না, কেহ তাহার জন্য হাহাকার করিবে না! কি প্রয়োজন তাহার এই জীবনে! কি আশা, কোন্ আনন্দ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে এই পৃথিবীতে মানুষের মাঝখানে! না, কোনো প্রয়োজন নাই তাহার জীবনে,—পৃথিবীর আবর্জ্জনা সে! নীরজা নীচের দিকে চাহিল,—এই তেতলার ছাদ হইতে ওই নীচে রাস্তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলে......! বাস্! তখন তো তাহার সেই প্রাণহীন মৃত দেহটাকে কোনো পুরুষ ধরিতে আসিবে না, ছুঁইতে আসিবে না। নীরজা অনেকক্ষণ ধরিয়া এই কথাটা মনের মধ্যে নাড়া-চাড়া

করিতে লাগিল। যতই সে এই কথাটা ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল—এমন সুন্দর সহজ মুক্তি তাহার সম্মুখে রহিয়াছে, তবে তাহার দুঃখ কি! নীরজা আবার একবার নীচের দিকে তাকাইল। তা'রপর আস্তে-আস্তে ছাদের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। চিরবিদায়ের ক্ষণে একবার সে চতুর্দ্দিকে তাহার উদাস নয়নের ক্লান্ত দৃষ্টি বুলাইয়া লইল,—এই সুপ্তি-মগ্ন জগৎ যখন কাল ভোরের আলোয় জাগিয়া উঠিবে, তখন সে কোথায়—কোন্ সে সুদূর অজানা লোকে!......

সহসা তাহার কাণে ধ্বনিয়া উঠিল—সেই স্বপ্নে-শোনা মুক্তির আহ্বান—এস নীরা আমার কাছে! নীরজা চমকিয়া উঠিল! মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে এ কোন্ চিরজীবনের অভয়-বাণী কোন্ কল্পলোক হইতে এমন করিয়া তাহাকে ডাকিতেছে!......না, না, সে মরিবে না! মরিবে না! এ মুক্তির বাণী তো মরণের ওপারে নয়, এপারে,—এই স্নেহ-প্রেমভরা জগতের মাঝখানে!

৩

অলোককে কেহ বলিত পাগল, কেহ বলিত খেয়ালে, কেহ

বলিত লক্ষ্মীছাড়া, কেহ বা বলিত সেণ্টিমেণ্ট্যাল্। এইরূপে অনেকে অনেক আখ্যায় তাহাকে অভিহিত করিত। কিন্তু সে-যে যথার্থই কি, সে-কথা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারিত না। মন দিয়া লেখাপড়া করিতে কেহ কোনো দিন তাহাকে দেখে নাই, কিন্তু স্কুলের নীচের ক্লাস্ হইতে আরম্ভ করিয়া সে একে-একে বি-এ পর্য্যন্ত অনায়াসে পাশ করিয়া ফেলিয়া এম্-এ পড়িতে লাগিল। মড়া পোড়াইতে, রোগীর সেবা করিতে, মারামারি করিতে, টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে, ভলাণ্টিয়ারী করিতে তাহার জোড়া কেহ ছিল না। রাস্তা দিয়া চলিতে-চলিতে যেই দেখিল কোনো সবল ব্যক্তি এক দুর্ব্বলকে প্রহার করিতেছে, অমনই সে কোনো কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া, সেই সবল ব্যক্তির উপর পড়িয়া তাহাকে ধপাধপ্ ঠেঙ্গাইতে সুরু করিয়া দিল ; যেই শুনিল অমুকের বাড়ী মড়া মরিয়াছে, লইয়া যাইবার লোক নাই, অমনই সে কি জাতি কি ধর্ম্ম সে-বিষয়ে কোনো সন্ধান না লইয়া, এখান হইতে ওখান হইতে জনকতক বাহক সংগ্রহ করিয়া, মড়া শ্মশানে লইয়া গিয়া গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া পোড়াইয়া আসিল ; কোনো দেশ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, অমনই অলোক কলেজ কামাই করিয়া চাল-ডালের বস্তা,

কাঁধে ফেলিয়া ছুটিল ভলান্টিয়ারী করিতে। তাহার পায়ে জুতা কেহ বড় একটা দেখিতে পাইত না এবং তাহার জামা-কাপড় ছিল নিতান্তই সাধাসিধা-ধরণের। শরীরে ছিল তা'র অসীম শক্তি, বুকে ছিল দুর্জ্জয় সাহস। লজ্জা বা ভয় বলিয়া কোনো জিনিষ তাহার কোষ্ঠিতে লেখা ছিল না,—যে-কাজের মধ্যে সে কোনো অন্যায় বা মন্দ দেখিতে পাইত না, জগতের কোনো লজ্জা, কোনো ভয়ই তাহাকে সে-কাজ হইতে নিরস্ত করিতে পারিত না। প্রাণটা ছিল তা'র বনের পাখীর মত মুক্ত-উদার, তাই বাঁধন সে একেবারেই সহিতে পারিত না এবং কিছুর মধ্যে বাঁধা পড়িবার উপক্রম হইলেই সে সেখান হইতে একে-বারে উধাও হইত। সেইজন্য কাহাকে যে সে ভাল বাসিত এবং কাহাকে বাসিত না, সে-কথা বলা ছিল এক অতি দুরূহ ব্যাপার।

তাহার পিতা মিঃ এস্. কে. চ্যাটার্জ্জী কলিকাতা হাইকোর্টের একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার্ ছিলেন। যেমন দু'হাতে অগাধ পয়সা তিনি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি দু'হাতে অগাধ পয়সা উড়াইয়া গিয়াছেন। বাড়ীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণটা বরাবরই একটু আল্‌গা-রকমের ছিল। অনেকে বলে নাকি প্রথম-যৌবনে

তিনি তাঁহার এক বাল্যবন্ধুর বিধবা-স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন এবং ক্রমে-ক্রমে সে-আসক্তি নিবিড় অনুরাগে পরিণত হইলে তিনি তাহাকে সংসার হইতে বাহির করিয়া আনিয়া আলাদা এক বাড়ীতে তাহাকে রাখেন। তাহার গর্ভে তাঁহার এক-আধটি সন্তানাদিও নাকি হইয়াছিল। যা'ক্, সে-সব অনেক-দিনের কথা; তিনি আজ আর এ-জগতে নাই এবং সেই কুলত্যাগিনী বিধবাও আজ বাঁচিয়া আছে কি না, সে-কথা কেহ বলিতে পারে না।

পঁয়তাল্লিশ-বৎসর বয়সে হঠাৎ একদিন যখন মিঃ চ্যাটার্জী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন অলোকের বয়স মাত্র চৌদ্দ-বৎসর। সেই হইতে অভিভাবক বলিতে একমাত্র বিধবা মা ছাড়া তাহার আর-কেহ ছিলেন না। মা'র প্রতি অলোকের অজস্র স্নেহ-ভক্তি থাকিলেও জীবনযাত্রার বিষয়ে তাঁহার মত বা আদেশের ধার সে ধারিত না। পিতার মৃত্যুর পর এই দীর্ঘ নয়টা বৎসর লেখাপড়া, চলা-ফেরা, বেশ-ভূষা প্রত্যেক বিষয়েই সে সম্পূর্ণরূপে তাহার স্বাধীন চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই চলিয়াছে। ইহার ফলে একটা কঠিন আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা তাহার চরিত্রের মধ্যে

ধীরে-ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার পিতা তাঁহার এই একমাত্র পুত্রের জন্য পুরী, রাঁচি, ও কলিকাতায় খান-আষ্টেক বাড়ী ও ব্যাঙ্কে নগদ তিন-চার লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং অলোককে নিঃসন্দেহে ধনী বলা যায়। কিন্তু কোনো-রূপ ঔদ্ধত্য বা দাম্ভিকতা তাহার আচরণে কেহ কোনোদিন অনুভব করে নাই, বরং যাহারা তাহার ভিতরের-খবর না জানিত, তাহারা তাহার বেশ-ভূষা ও চাল-চলনে তাহাকে দরিদ্র বলিয়াই ঠাওরাইত।

বিজয়ের প্রকৃতিটা ছিল ঠিক অলোকের উল্টা ছাঁচে গড়া। সে ছিল অলস, বিলাসী, উদ্ধত ও আত্মনির্ভরতাহীন। তাহার পিতা পাটের দালালি করিয়া বেশ মোটারকম উপার্জ্জন করিতেন। তিনি খুব হিসাবী লোক ছিলেন এবং বিলাস-ব্যসন তাঁহার জীবনে একেবারেই ছিল না। সুতরাং ছেলের বাবুয়ানি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রচুর অর্থ তিনি রাখিয়া গিয়া-ছেন। তাঁহার পাঁচ-ছয়টি ছেলে-মেয়ের মধ্যে একমাত্র ওই বিজয়ই বাঁচিয়া আছে, সুতরাং বিজয়ের ভাগ্যে জুটিয়াছিল মা-বাপের একটানা আদর-আব্দার। সে দয়া করিয়া কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকুক, ইহা ছাড়া তাহার পিতা-মাতা তাহার নিকট

হইতে আর-কিছুই চাহিতেন না। ইহার স্বাভাবিক ফল যাহা দাঁড়ায় বিজয়ের তাহাই দাঁড়াইয়াছিল। লেখাপড়ায় তাহার আদৌ মন ছিল না; আড্ডা মারিয়া, ইয়ারকি করিয়াই সে বেশীর ভাগ সময় কাটাইত এবং বাবুয়ানি করিয়া, স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতে ভালবাসিত। পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন বিজয়ের বয়স কুড়ি বছরের কাছাকাছি, স্কুলে থার্ড্ ক্লাসে তখন তাহার নাম ছিল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই সে স্কুলে তাহার অনাবশ্যক নামটা কাটাইয়া দিল এবং জীবনটাকে সব দিক হইতে উপভোগ করিয়া তাহার পিতার পরিশ্রম-সঞ্চিত অগাধ অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

অলোক ও বিজয় অতি নিকট প্রতিবেশী; একই পাড়ায় একই রাস্তার উপর তাহাদের বাড়ী। তাহাদের বন্ধুত্ব বহুদিনের, ছেলেবেলায় তাহারা একসঙ্গে খেলা করিয়াছে, স্কুলে নীচের দিকে তাহারা একসঙ্গে পড়িয়াছে। তা'রপর বড় হইয়া যখন অলোক বিজয়কে পিছনে ফেলিয়া স্কুল্ হইতে কলেজে প্রবেশ করিল, তখনও তাহাদের বন্ধুত্ব তেমনই অটুট রহিল। এই বন্ধুত্বের একটা প্রধান কারণ—বিজয়ের মনের মধ্যে অলোকের প্রতি একটা আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধার

ভাব ছিল ; তাহার বিশ্বাস ছিল অলোক একটা অসাধারণ মানুষ, সেই জন্য তাহার সকল খেয়ালকে সে বরাবরই অকুণ্ঠিত-চিত্তে মানিয়া চলিয়াছে, এবং তাহার কোনো আচরণেই সে কোনোদিন অপমান বা দুঃখ অনুভব করে নাই। বিজয়ের সমস্ত অহঙ্কার, সমস্ত ঔদ্ধত্য অলোকের সম্মুখে আসিলেই কেমন যেন নিভিয়া যাইত, এবং অলোকের উপদেশ বা পরামর্শগুলাকে সে আদেশের মতই গ্রহণ করিত। বিজয়ের আরও অনেক বন্ধু ও মোসাহেব ছিল, কিন্তু অলোককে না পাইলে তাহার সমস্ত আমোদ-প্রমোদ যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

যখন নীরজার সন্ধান পাইয়া বিজয় প্রথম তাহার কাছে যায়, সেদিন সে একেলা গিয়াছিল, অলোককে সঙ্গে লয় নাই, কারণ নীরজা অলোককে দেখাইবার যোগ্য কি না সে-বিষয়ে নিশ্চিত না হইয়া সে কি করিয়া অলোককে সেখানে লইয়া যাইবে! তা'রপর দু'-এক দিন একেলা আনাগোনা করিয়া যখন সে নিঃসন্দেহে বুঝিল হাঁ, আলোককে এখানে আনা যাইতে পারে, তখন সে তাহাকে সকল কথা বলিয়া নীরজার বাড়ীতে লইয়া গিয়া হাজির করিল।

নীরজার বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে অলোক অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে বেশ আরাম করিয়া হাত-পা ছড়াইয়া, হেলান দিয়া নীরজার গানের সুরটা শিষ দিয়া বাজাইতে লাগিল।

যতক্ষণ অলোক আপন-মনে শিষ দিতে লাগিল, ততক্ষণ বিজয় চুপ করিয়া রহিল, তাহাকে বিরক্ত করিল না। অলোকের শিষ থামিলে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়েটাকে কেমন লাগ্‌লো অলোক?"

অলোক নির্ব্বিকার-চিত্তে বলিল—"জানি না।"

বিজয় বলিল—"জানি না মানে?"

অলোক বলিল—"ওরে মূখ্যু, পৃথিবীতে সব জিনিষই কি এত ছোট যে, ভালো লাগ্‌লো বা মন্দ লাগ্‌লো ব'লে ফেল্‌লেই শেষ হ'য়ে যায়! ভালো লাগা, মন্দ লাগার বাইরে যে অনেক জিনিষ আছে রে!"

অলোকের কথার অর্থ বিজয় কিছুই বুঝিল না, কিন্তু অলোক যে অসাধারণ কিছু একটা বলিতেছে, ইহা মনে করিয়া বিজয় পুলকিত হইয়া উঠিল।

অলোক বলিল—"ওহে তোমার কোচ্‌ম্যান্‌কে ব'লে দাও যেন এখনই বাড়ী না ফেরে, গাড়ী একটু চ'লুক্।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যেতে চাও ?"

অলোক বলিল—"যেতে কোথাও চাই না, শুধু খানিকটা ঘুরতে চাই।"

বিজয় বলিল—"সে কি! এই-যে একটু আগে বাড়ী ফের্‌বার জন্যে ব্যস্ত হ'য়েছিলে!"

অলোক হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, নেশাটা বড্ড জ'মে আস্‌ছিল, তাই স'রে প'ড়্‌তে চাইছিলুম।"

বিজয় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি মদ খেলে কখন যে নেশা জ'মে উঠ্‌লো ? তুমি কি মদের গন্ধে মাতাল হও ?"

অলোক তেমনি হাসিয়া বলিল—"শুধু মদই মানুষকে মাতাল করে না হে, মাতাল হ'তে জান্‌লে মদ ছাড়া অনেক জিনিষেই মাতাল হওয়া যায়!"

বিজয় বলিল—"তোমার কথা কেবলই হেঁয়ালি।"

অলোক বলিল—"আরে, হেঁয়ালি কর্‌বার জন্যেই তো ভাষার স্বষ্টি হ'য়েছে!"

বিজয় বলিল—"যা'ক্ ওসব বাজে কথা! আমি এই মেয়েটাকে বাঁধা রাখ্‌বো ভাব্‌ছি, সে-বিষয়ে তোমার কি মত ?"

অলোক জিজ্ঞাসা করিল—"কত হ'লে সে বাঁধা থাকে ?"

বিজয় বলিল—"তা'র মা'র সঙ্গে আমার এ-বিষয়ে কথা হ'য়েছে। তা'র মা মাসে পাঁচ-শ' টাকা চায়।"

অলোক কোনো উত্তর দিল না, চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি ব'ল ?"

অলোক বলিল—"না, তা' হ'তে পারে না।"

বিজয় বলিল—"কেন ভাই, অমন মালের জন্যে মাসে পাঁচ-শ' টাকা কি খুব বেশী হ'লো ?"

একটু যেন তিক্ত-কটু-স্বরে অলোক বলিল—"না বেশী নয়, তোমার মতন চরিত্র-হীনের পক্ষে একটা বেশ্যার পেছনে মাসে পাঁচ-শ' টাকা ওড়ানো এমন কিছুই নয়, তা' জানি। কিন্তু বিজয়, মানুষের জীবনে টাকাটাই একমাত্র ভেবে দেখ্‌বার জিনিষ নয়, টাকা ছাড়া আরও অনেক ভাব্‌বার জিনিষ আছে। যদি কোনোদিন এ মেয়েটি তোমার বাঁধা রাখ্‌বার মতন হয়, তা'-হ'লে তখন তা'কে বাঁধা রেখো—এখন নয় !"

বিজয় আর কোনো উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া অলোকের কথাগুলা অনেকক্ষণ ধরিয়া মনের মধ্যে নাড়াচাড়া

করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কোনো অর্থই সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। কেন অলোক আজ মধ্যে-মধ্যে এত গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে! কেন সে আজ তাহাকে এমন করিয়া পদে-পদে বাধা দিতেছে! ইহার পূর্ব্বে কোনোদিন তো সে এ-বিষয়ে এমন করিয়া কথা কহে নাই! আজ তাহার হইল কি! এটা কি তাহার শত অর্থহীন খেয়ালেরই একটা,—না, আর কিছু!

দু'জনে কেহই আর কোনো কথা কহিল না, অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে ঠেসান দিয়া তাহারা নিঃশব্দে নিজের-নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া রহিল। বিজয়ের মনে জাগিতেছিল—একটি পরিপূর্ণ-যৌবনা বেশ্যার উদ্ভিন্ন-নিটোল দেহখানি, আর উন্মনা অলোকের লক্ষ্যহীন চক্ষের সম্মুখে মৌন মহিমায় ফুটিয়া উঠিতে-ছিল—এক আশাহীনা হতভাগিনীর অশ্রু-সজল আঁখি-দু'টি!

৪

পরদিন সকালে খুব ভোরে হঠাৎ অলোকের ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। শীতের জন্য ঘরের জানালাগুলা বন্ধ ছিল, আস্তে-আস্তে উঠিয়া সমস্ত জানালা খুলিয়া দিয়া সে সার্‌শিগুলা বন্ধ করিয়া

দিল। তা'রপর লেপ্‌টা ভাল করিয়া মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া, সার্‌শির কাঁচের ভিতর দিয়া বাহিরের কুয়াশা-ঢাকা আকাশের পানে অলস-নয়নে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

গত রাত্রির কথা স্মরণ হইতেই তাহার মনে পড়িল নীরজাকে। তাহার মনে হইল—আজ ওই বেশ্যা সকলের ঘৃণিতা, সতীত্বের-গণ্ডী-ঘেরা সংসারের মাঝখানে তাহার তিলমাত্রও স্থান নাই, সমাজের রুদ্ধ দুয়ারের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া বুক চাপ্‌ড়াইয়া যদি সে সারাজীবন ধরিয়া আর্ত্তনাদ করে, তবু সে-দুয়ার তাহার জন্য একটুও ফাঁক হইবে না!—কেন-না, তাহার দেহকে একের অধিক পুরুষ স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু ওই নীরজা যদি আজ এই লক্ষ-কৃত্রিমতা-ভরা সভ্যতার যুগে না জন্মাইয়া জন্মাইত সহস্র-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, মানব-জাতির ইতিহাসের সেই কোন্ বিস্মৃত যুগে,—যখন মানুষ নগ্ন-অনাবৃত দেহে উদার আকাশ-তলে বনের প্রাণীর মত মুক্ত-অবাধ জীবন যাপন করিত, যখন লক্ষ বিধি-বিধানের নাগপাশ মানুষকে এমন করিয়া আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধিয়া রাখে নাই, যখন সমাজ ছিল না, সংস্কার ছিল না, শাস্ত্র ছিল না, ধর্ম্ম ছিল না,—সেই আদিম যুগে জন্মাইলে তো নীরজাকে

কেহই ঘৃণা করিত না, তখন সে সকলের মাঝখানে পাঁচজনের একজন হইয়া নিশ্চিন্তে-নির্ব্বিঘ্নে সুখে-আনন্দে জীবনটা কাটাইতে পারিত! সেই প্রাচীন যুগ হইতে এই সহস্র-সহস্র বৎসর ধরিয়া মানুষের জীবনে কত বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! এখন মানুষ অঙ্গ আবৃত করে, সমাজের মধ্যে বাস করে, সংস্কারের পায়ে মাথা নোয়ায়, এখন নর-নারীর মধ্যে বিবাহ উদ্ভূত হইয়াছে, সতীত্ব বলিয়া একটা জিনিষ জাগিয়া উঠিয়াছে, কত জ্ঞান মানুষ লাভ করিয়াছে, কত বৈজ্ঞানিক তথ্য সে আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু যত-কিছু অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যই সে ক'রুক, সেই পুরাতন আদিম যুগের অসভ্য-অজ্ঞান মানুষের চেয়ে আজিকার এই সভ্য, জ্ঞানী, উন্নত মানুষ বেশী কী পাইয়াছে! এখন মানুষ সহস্র ক্রোশ দূরে মানুষের সঙ্গে বিনা-তারে কথা কয়, চন্দ্রলোকের ছবি তোলে, মঙ্গল-গ্রহে সংবাদ পাঠায়, পাখীর মত ডানা মেলিয়া হাওয়ায় ওড়ে! কিন্তু সে নিজে কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, জন্মের পূর্ব্বে সে কি ছিল, মৃত্যুর পরে কি হইবে,— সে-সন্ধান কি এই কত-সহস্র বৎসরের সাধনায় মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিয়াছে! আজ নীরজাকে মানুষ ঘৃণা করিতেছে, কিন্তু কেন সে কোনো পূজ্যা সতীলক্ষ্মীর পুণ্য গর্ভে

না জন্মাইয়া, এক ঘৃণিতা কলুষিতা বারনারীর জঠরে জন্মাইল,—ইহার কারণ কি কেহ বলিতে পারে! আর, যদিই বা সে জন্মাইয়াছে এক বেশ্যার গর্ভে, তাহার অপরাধ কোন্‌খানে! এক অতি ক্ষুদ্র, অতি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য কোষরূপে সে তাহার জননীর জঠরে প্রথম আবির্ভূতা হয়,—সেই তাহার অস্তিত্বের প্রথম সূচনা। তা'রপর সেই ক্ষুদ্র কোষটি প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় বিধানে ধীরে-ধীরে বড় হইয়া, বহু কোষে বিভক্ত হইয়া, মানব-দেহে পরিণত হইয়া, অবশেষে একদিন এই জীবন-চঞ্চল ধরণীর বুকে শিশু-কন্যারূপে ভূমিষ্ঠা হয়। তা'রপর তা'র সেই ক্ষুদ্র শিশুদেহ এই সতেরোটি বৎসর ধরিয়া দিনের-পর-দিন একটু-একটু করিয়া বড় হইয়া আজ ওই যৌবন-দীপ্তা নারীরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এই-যে তাহার মানবী-জীবনের বিরাট ইতিহাস,—ইহার মধ্যে তাহার অপরাধ কোন্‌খানে!

অলোক মনে-মনে বলিল—না, সমাজ, সংস্কার, শাস্ত্র, ধর্ম্ম,—এ-সবই মিথ্যা, যদি মানুষকে তাহারা না মানে; কী প্রয়োজন এদের, যদি মানুষের বুকের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, ক্ষুধা-তৃষ্ণার পানে তাহারা ফিরিয়া না চায়। নীরজা বেশ্যা!—কেন-না তাহার দেহটা বেশ্যার রক্তে গড়া, তাহার দেহটায় একাধিক

পুরুষ হাত দিয়াছে। কিন্তু মানুষের দেহখানাই কি মানুষ!—সেই দেহের অন্তরালে, রক্ত-স্রোতের তালে-তালে মানুষের বুকের মাঝখানটিতে যে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত ধুকধুক্ করিতেছে, সেগুলা কি কিছুই নয়! নীরজা অসতী! কিন্তু সতীত্বের অর্থ কি! মানুষের ইতিহাসে সতীত্ব তো চিরকাল ছিল না, চিরটা কাল যে থাকিবে, তা'ই-বা কে জোর করিয়া বলিতে পারে! এই সতীত্বের মাপকাঠিও তো কিছুই নাই, যুগে-যুগে দেশে-দেশে ইহার স্বরূপ বিভিন্ন; নিজের সুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে মানুষ ইহাকে নানা আদর্শে গড়িয়াছে,—তবে এই সতীত্বকে বিশ্বের একটা অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বলিয়া কি করিয়া মানিব! তবে মানুষের-গড়া এই সতীত্বের জন্য বিধাতার-গড়া মানুষকে আজ কি করিয়া অবহেলা করা যায়!......

অলোক বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখ ধুইয়া তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা খাইয়া সে বিজয়ের বাড়ী ছুটিল।

বিজয় তখনও আপাদমস্তক লেপে ঢাকিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। অলোক ঠেলাঠেলি করিয়া তাহাকে উঠাইল। বিজয় চোখ চাহিয়া অলোককে সম্মুখে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল,—এমন সময়ে তো অলোক কোনোদিন আসে না! চোখ

রগ্‌ড়াইতে-রগ্‌ড়াইতে সে বলিল—"কিহে, হঠাৎ এত সকালে কি মনে ক'রে ?"

অলোক বলিল—"তোমার পক্ষে এখন খুব সকাল হ'তে পারে, কিন্তু ঘড়িতে সাড়ে-সাত্‌টা বাজে।"

বিজয় বলিল—"আরে, শীতকালের সাড়ে-সাত্‌টা সকাল না তো কি! যা'ক্‌গে, তা'রপর হঠাৎ এমন অসময়ে কেন তোমার আবির্ভাব, বলো দিকিন্‌।"

অলোক বলিল—"আগে উঠে মুখ-চোখ ধুয়ে এস, তা'রপর ব'ল্‌ছি!"

বিজয় কৌতূহলের তাড়নায় তাড়াতাড়ি লেপ্‌ ফেলিয়া উঠিয়া মুখ ধুইয়া আসিয়া বেয়ারাকে চায়ের হুকুম করিল। তা'রপর অলোককে লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল—"এইবার বলো এমন অসময়ে তোমার পায়ের ধূলো প'ড়লো কেন।"

অলোক কোনো-রকম ভূমিকা না করিয়া স্পষ্ট বলিল—"আমি নীরজাকে বাঁধা রাখ্‌বো ঠিক ক'রেছি, তা'ই তোমায় ব'লতে এসেছি।"

এমন-একটা অদ্ভুত কথা যে কখনও সত্য হইতে পারে, ইহা

বিজয়ের মনেই হইল না। সে মনে করিল অলোক ঠাট্টা করিতেছে ; তাই সে হাসিয়া বলিল—"তা' বেশ, মানাবে ভালো ! তবে, আমায় সঙ্গে নিতে ভুলো না, উলু দেবার তো একটা লোক চাই।"

অলোক গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল—"না বিজয়, ঠাট্টা নয়, আমি তোমায় সত্যিই ব'লছি !"

বিজয় অলোকের মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। সত্যই তো, অলোকের মুখে কৌতুকের কোনো চিহ্ন নাই ! তবে কি অলোক যথার্থই এই মতলব আঁটিয়াছে ! তবু তাহার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ উঁকি মারিতে লাগিল—বোধ হয় অলোক গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া তাহার সহিত ঠাট্টা করিতেছে। এই সন্দেহের মীমাংসার জন্য সে জিজ্ঞাসা করিল—"হঠাৎ এ-মতলব তোমার মাথায় ঢুক্‌লো কি ক'রে ? কই কাল রাত্তিরে তো কিছুই বলো-নি !

অলোক বলিল—"না কাল রাত্তিরে কিছুই মনে হয়-নি। কেন, কি ক'রে এ-সব কথা মনে হ'য়েছে, তা' তোমায় আজ ব'লবো না, তবে এটা ঠিক যে এ-বিষয়ে আমি স্থির-সঙ্কল্প। পাছে তুমি অন্য-কিছু মনে ক'রে দুঃখ পাও, তাই আগে তোমায় জানাতে এলুম।"

বিজয় কিছু বলিল না। সে অবাক হইয়া মেজের দিকে

এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল—এই কি সেই অলোক !—যে চিরদিন মুক্ত-নির্ব্বিকার, জগতের কোনো জিনিষই কোনো-দিন যাহাকে বাঁধিতে পারে নাই ! কত সুন্দরী লীলাময়ী বারাঙ্গনার কাছে এই অলোককে লইয়া গিয়া কতদিন কতভাবে সে তাহার চরিত্রের পরীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু পর্ব্বতের মত অচল-অটল তাহাকে কোনো সুন্দরীই তিলমাত্র টলাইতে পারে নাই। এই সেই অলোকের চরিত্র-বল ! তবে কি সে-সব মিথ্যা, মেকি ! বাল্যকাল হইতে এই অলোককে তাহার সাহস, দৃঢ়তা ও হৃদয়ের শক্তির জন্য সে মনে-মনে কত-না ভালবাসিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে ! এই কি আজ তাহার শক্তির পরিচয় ! একটা সুন্দরী তরুণী বেশ্যার মোহ সে সাম্‌লাইতে পারিল না ! এই লোভ তাহার লুব্ধ মনের কোণে লুকাইয়া ছিল বলিয়াই কাল সে পদে-পদে তাহাকে বাধা দিয়াছে, তাই কাল নীরজাকে বাঁধা রাখিবার প্রস্তাব তুলিতেই সে অমন করিয়া আপত্তি জানাইয়াছিল। এত ক্ষুদ্র, এত দুর্ব্বল, এত শিথিল-চরিত্র সে, আর তাহাকেই সে অত শ্রদ্ধা করিত ! ছিঃ ! .....

অলোক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"বিজয়, তোমায় আমার একটা কাজ ক'রতে হবে।"

বিজয় কিছু না বলিয়া, দৃষ্টি তুলিয়া জিজ্ঞাসু-নয়নে অলোকের মুখের দিকে চাহিল।

অলোক বলিল—"ক'রবে ?"

বিজয় গম্ভীরভাবে বলিল—"ক'রবো।"

অলোক বলিল —"ঠিক ?"

বিজয় বলিল—"ঠিক।"

অলোক হাসিয়া বলিল—"সে-কাজ তোমার পক্ষে অসম্ভব কি-না, তা' না-জেনেই তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রছো ?"

বিজয় তেমনি গম্ভীরভাবে বলিল—"হ্যাঁ, যতই অসম্ভব হো'ক তবু ক'রবো! দেখাবো যে, চরিত্রবানের জন্য চরিত্রহীন কতখানি ক'রতে পারে!"

বিজয়ের এই শ্লেষে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অলোক পকেট হইতে একখানা পঞ্চাশ-টাকার নোট্ বাহির করিয়া বলিল —"আজ সন্ধ্যা-বেলা তুমি নীরজার মা'র কাছে একবার গিয়ে তা'য় হাতে এই নোটখানা দিয়ে ব'লবে যে, আজ আর কাল এই দু'-দিন কোনো লোককে যেন সে তা'র মেয়ের কাছে যেতে না দেয়। আমি পরশু নীরজার কাছে যাব, কিন্তু তুমি সে-সব কথা তা'দের ঘুণাক্ষরেও বোলো না।—আর একটা কথা, তুমি

এই নোট্‌খানা মানদার হাতে দিয়েই চ'লে আস্‌বে, নীরজার কাছে যাবে না!"

বিজয় অলোকের হাত হইতে নোট্‌খানা লইয়া শুষ্ক-কণ্ঠে কেবলমাত্র বলিল—"আচ্ছা!"

অলোক "চ'ল্লুম" বলিয়া বিজয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, বিজয় মূঢ় বিস্ময়ে তাহার অদৃশ্যমান মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল।

৫

বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া জলযোগাদির পর তাহার শোবার-ঘরের সম্মুখের বারান্দায় এক ইজি-চেয়ারের উপর শুইয়া অলোক একখানা রুশ্‌ নভেল্‌ পড়িতেছিল।—এক অতি দরিদ্রা তরুণী শ্রমিক-কন্যার দগ্ধ-জীবনের কাহিনী! তাহার কোনো সহায় নাই, সম্বল নাই; পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে কেবলমাত্র তাহার যক্ষ্মা-পীড়িতা শয্যাশায়িনী বিধবা মা। গতর খাটাইয়া সে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে সে নিজে একবেলা অনাহারী থাকিয়াও তাহার সেই মৃত্যুর-যাত্রিণী মা'র চিকিৎসা

ও পথ্যের সংস্থান করিতে পারিত না। তাহার এই দুঃখের কাহিনী বলিয়া কত ধনীর প্রাসাদ-দুয়ারে সে কাঁদিয়া হাত পাতিয়াছে, কিন্তু দরিদ্রের দুঃখ শুনিবার অবসর ধনীর কোথায়! সকলেই তাহাকে অবজ্ঞায় তাড়াইয়া দিয়াছে। এক ধনীর চরিত্রহীন পুত্র তাহার কাছে গোপনে কু-প্রস্তাব করিয়া অনেক অর্থ দিতে' চাহিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসে। অবশেষে যখন কোনো উপায় সে করিতে পারিল না, তাহার চক্ষের সম্মুখে তাহার জননী চিকিৎসাভাবে ধীরে-ধীরে মরণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন নিতান্ত নিরুপায়া সে, সেই ধনীর পুত্রের কাছে তাহার নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠরত্ন বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া মা'র চিকিৎসা করাইতে লাগিল। কিন্তু এত করিয়াও সে তাহার মা'কে বাঁচাইতে পারিল না, কিছুদিন সেই মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগিয়া তিনি ইহ-জীবনের মায়া কাটাইলেন। মা তাহার চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেই পিতৃ-মাতৃহীনা অনাথিনীকে কেহ আর ডাকিয়া লইল না, কেহ তাহাকে ক্ষমা করিল না, সমাজের দুয়ার তাহার জন্য চিরদিন রুদ্ধ রহিয়া গেল,—আর, সে-অভাগিনী কলঙ্কের অক্ষয় টীকা কপালে পরিয়া সারাটা জীবন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল!......

ছিন্ন-তার

সায়াহ্নের ম্লানায়মান আলো ক্রমে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল, আর পড়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। বইখানা মুড়িয়া পাশে রাখিয়া অলোক মাথার নীচে হাত-দুইটা দিয়া খানিকক্ষণ ধূসর-মৌন সন্ধ্যাকাশের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার মনে হইল—এই-যে বাতাস জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা গ্রহণ করিতেছি, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া কত ব্যথিতের কত বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস যে ইহার স্তরে-স্তরে জমাট্ বাঁধিয়া আছে, কেহ কি তাহার কোনো হিসাব দিতে পারে!

ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। অলোক চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল,—সে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল যে আজ তাহার নীরজার কাছে যাইবার কথা।

কাপড়-জামা না বদ্‌লাইয়া, সে যে-বেশে শুইয়া বই পড়িতে ছিল, ঠিক সেই-বেশেই নীরজার বাড়ী চলিল। অনেকখানি হাঁটিয়া অবশেষে রামবাগানে আসিয়া সে নীরজার বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

সদর-দরজার পাশে রোয়াকে শুইয়া একটা পশ্চিমি দরোয়ান তাহার সদ্য-সেবিত গঞ্জিকার আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। সে বহুদিন ধরিয়া মানদার কাছে চাক্‌রী করিতেছে। অলোক

প্রবেশ করিতেই সে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কা'কে চান্ বাবু ?"

অলোক গম্ভীরভাবে বলিল—"চাই ওপরের মেয়েমানুষটিকে।"

দরোয়ান বলিল—"বিবিকে আগে খবর না দিয়ে তো কারুর ওপরে যাবার হুকুম নেই।"

অলোক কিছুমাত্র বিচলিত না-হইয়া বলিল—"খবর দিতে হয় তুমি দাওগে, তা'র জন্যে আমি হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।" এই বলিয়া অবজ্ঞাভরে গট্-গট্ করিয়া ভিতরে চলিয়া আসিল। অলোকের চেহারা ও হাবভাবে দরোয়ান তাহাকে আর ঘাঁটাইতে সাহস করিল না।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উপরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই অলোক দেখিল সম্মুখে মানদা দাঁড়াইয়া। সহসা অলোকের এই অতর্কিত আবির্ভাবে মানদা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল। একটা কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া অলোক বলিল—"এই যে ঠাকরুণ, নরকের দ্বারপালের মতন দাঁড়িয়ে আছ! বেশ!"

মানদা রুক্ষ-কণ্ঠে বলিল—"কি চাও বাপু তুমি ?"

অলোক তেমনি হাসিয়া বলিল—"তোমার বাড়ীতে ছোক্‌রা বাবুরা কি চাইতে আসে, তা' কি জান না বাবা! চাই তোমার

মেয়েটিকে, তোমায় চাইবার বয়স তোমার বহুদিন গত হ'য়ে গেছে!"

এইবার মানদা একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল—"আমার মেয়ে কি রাস্তায় বেওয়ারিশ প'ড়ে আছে যে, যে-সে তা'র কাছে আস্‌বো মনে ক'রলেই আস্‌বে! যাও, সোজা পথ দেখগে!"

অলোক পকেট হইতে একতাড়া নোট্ বাহির করিয়া বলিল—"রাগো কেন ধন! আমি অম্‌নি আসিনি। এই নাও পাঁচ-শ' টাকা হিসাবে তিন-মাসের মাসহারা দেড়-হাজার টাকা, গুণে নাও।" এই বলিয়া নোটের তাড়াটা মানদার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিল।

মানদা নোটের তাড়াটা সযত্নে উঠাইয়া লইয়া কয়েক-মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক বিস্ময়ে অলোকের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে এক তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল,—ওই আধ-ময়লা জামা-কাপড়-পরা, চটিজুতা-পায়ে লোকটা একসঙ্গে দেড়-হাজার টাকা কোথা হইতে পাইল! কোথাও হইতে চুরি করিয়া আনিল না-ত! আর, বেশ্যা-বাড়ীতে স্ফূর্ত্তি করিতে আসিবার পোষাক তো এ নয়! লোকটার মনে কি কোনো বদ মতলব আছে! দরকার নাই ডাকিয়া বিপদ ঘরে আনিয়া।......পরক্ষণেই

তাহার মনে হইল—যেখান হইতেই লোকটা টাকা পাক্ না কেন, সে-কথা ভাবিবার তাহার প্রয়োজন কি! একসঙ্গে এমন অনায়াস-লব্ধ দেড়-হাজার টাকা ছাড়া তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অবশেষে অর্থ-লোলুপ মানদার মনে টাকার-লোভেরই জয় হইল; কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিয়া অভ্যর্থনার-ভাবে বলিল—"আচ্ছা আসুন, কিছু মনে ক'রবেন না।"

অলোক তাহাতে না গলিয়া বলিল—"নোটের তাড়াটি পেয়ে তো চট্ ক'রে সুরটি নামিয়ে আন্‌লে, কিন্তু তা'তে ভোল্‌বার পাত্তর্ আমি নই!" মুষ্টিবদ্ধ ঘুসিটা মানদাকে দেখাইয়া বলিল—"এই তিন-মাসের মধ্যে অন্য-কোনো লোককে যদি তোমার মেয়ের কাছে ভিড়্‌তে দাও তো, মনে থাকে যেন এই ঘুসিতে অনেক গুণ্ডার মাথা দু'খানা হ'য়েছে।"

মানদা এই অপমান গায়ে না মাখিয়া, জোর করিয়া মুখে খানিকটা হাসি ফুটাইয়া বলিল—"না-না, তা'-কি হয়! মানুষের বিশ্বাস কি আমরা ভাঙ্গ্‌তে পারি!"

অলোক গাম্ভীর্য্যের ভঙ্গী করিয়া বলিল—"রামঃ! কে বলে ও-কথা! বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি তোমরা!" এই বলিয়া মানদার

সঙ্গে আর অনাবশ্যক বাক্যব্যয় না করিয়া, অলোক নীরজার ঘরের দিকে চলিল।

নীরজার দুয়ারের পর্‌দাটা সরাইয়া যখন অলোক নিঃশব্দে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সে বিছানার উপরে উপুড়্‌ হইয়া এলাইয়া পড়িয়া, আনমনে একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্‌টাইতেছিল। অলোক প্রবেশ করিতেই সে চমকিয়া উঠিয়া, তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। একি!—অলোক!—একেলা!—এমন সময়ে!—তাহার ঘরে! নীরজার মনে হইল সে বোধহয় জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে!

অলোক বলিল—"এই-যে বিবি, এক্‌লাই আছ! আমি মনে ক'রেছিলুম বুঝি ঘরে লোক-টৌক আছে। তোমার দরোয়ান-সাহেব ত আমায় ঢুক্‌তেই দিচ্ছিল না!"

নীরজা মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আপনি ব'লে সে বাধা দেয়নি। অনেক বদ্‌-লোক এসে বড় উৎপাত করে, তাই মা ব'লে দিয়েছেন যে, আগে তাঁ'কে খবর না দিয়ে যেন কাউকে আস্‌তে না দেয়।"

অলোক বলিল—"রূপের কারবার ফেঁদে ব'সেছ, বদ্‌-লোকের

উৎপাত একটু-আধটু সইতে হবে বই-কি ভাই! সাধু-সন্ন্যাসীর দল কি-আর তোমার কাছে ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রতে আস্‌বে!"

অলোকের কাছ হইতে এতখানি রুক্ষ অপমান এতই অপ্রত্যাশিত যে, একটা চাপা অভিমানে নীরজার কণ্ঠ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে কিছু না বলিয়া ম্লান-মুখে মেজের দিকে চাহিয়া রহিল।

অলোক তাহাতে একটুও না দমিয়া আবার বলিল—"কি ভাই, বড্ড দুঃখু হচ্ছে যে, এক বড়লোক বাবু না এসে কোথাকার কে-একটা অগামারা মিন্‌সে এসে জুটলো? কিন্তু কি ক'রবে ব'ল, মাসে পাঁচ-শ' টাকা হিসাবে, তোমার ওই শরীরটার তিন মাসের ভাড়া—পূরো দেড়টি হাজার টাকা—এইমাত্তর্ তোমার মা-ঠাকরুণের শ্রীচরণে অর্পণ ক'রে এলুম, বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা ক'রে এসো। এখন তিন-মাসের মতন তোমার ওই সাজানো শরীরখানাকে আমার কাছে ভাড়া খাটাতে হবে, 'না' বল্‌বার যো-টি নেই!"

এইরূপ আঘাতের পর আঘাতে নীরজার রুদ্ধ অভিমান আর বাধা মানিল না। তাহার দুই-চোখ ফাটিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সজল-নয়নে সে বলিল—"সেদিন আমার

মর্য্যাদা আপনিই দয়া ক'রে বাঁচিয়েছিলেন, আজ কেন আমায় এমন ক'রে অপমান ক'রছেন,—আমি তো আপনার চরণে কোনো অপরাধ করিনি!"

সহসা নীরজার এই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে অলোক থমকিয়া গেল। নীরজার প্রাণের ভিতরটা যে এতখানি কোমল, সে-ধারণা তাহার মোটেই ছিল না। বেশ্যার মেয়ে সে, বেশ্যা-বৃত্তির জন্য তাহার নিয়তি তাহাকে গড়িয়াছে,—অর্থের জন্য কত অপমান, কত অমর্য্যাদার পায়ে অহরহ্ তাহাকে মাথা নোয়াইতে হইবে; তাহার হৃদয়টা তো কঠিন-অসাড় হইবে, কুলনারীর মত এত কোমলতা, এতখানি অভিমান তাহার আসিল কোথা হইতে!

অলোক এবার স্নেহের হাসি হাসিয়া আদর করিয়া বলিল—"দূর পাগ্‌লী, কেঁদে ফেল্‌লি! আচ্ছা, আর কোনোদিন কিছু ব'লবো না। এখন আমায় একটা গান শোনাও দিকিন্।" এই বলিয়া নীরজার দুই-হাত ধরিয়া উঠাইয়া অর্গ্যানের কাছে লইয়া গিয়া বলিল—"সেই গানটা গাও, সেদিন যেটা গেয়েছিলে।"

নীরজা আহ্লাদে গলিয়া গিয়া চোখ মুছিয়া গান ধরিল—

"সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে—"

ছিন্ন-তার

অলোক বিছানার উপর হাত-পা ছড়াইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া গান শুনিতে লাগিল।

গান শেষ হইলে অলোক ডাকিল—"এস নীরজা, আমার কাছে এসে ব'স।"

নীরজা উঠিয়া আস্তে-আস্তে অলোকের পাশে আসিয়া বসিল। অলোক তেমনি শুইয়া থাকিয়া, নীরজার কোলের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিল—"আচ্ছা নীরা, তোমার জীবনের ইতিহাস তুমি কিছু জান ?"

নীরজার কাণ-দুইটা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল,—এক ঘৃণ্যা বারাঙ্গনার জারজ কন্যা সে! এই হীন পরিচয় সে অলোকের কাছে কোন্-মুখে প্রকাশ করিবে ! সে দৃষ্টি ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

নীরজার মনের ভাব অলোক অনেকটা আন্দাজ করিল। সে বলিল—"এতে তোমার লজ্জা কি নীরা ! লজ্জা পাবে, যখন তুমি নিজে কোনো অন্যায় কাজ ক'রবে, অপরের লজ্জার বোঝা তুমি কেন বইবে !"

নীরজা অতি সঙ্কুচিত-কণ্ঠে ধীরে-ধীরে বলিল—"আমি বিশেষ কিছুই জানি না। মা'র মুখে কেবলমাত্র শুনেছি যে, তাঁ'র মা-ই

প্রথম সংসার ছেড়ে এসে এই হেয় পথ অবলম্বন করেন। তখন আমার মা'র জন্ম হয়নি। কেন-যে আমার দিদিমার এই দুর্ম্মতি হ'য়েছিল জানি না, মা-ও জানেন না। তবে যতদূর শুনেছি, তিনি অতি গরীব ছিলেন, কেউ তাঁ'কে দেখ্‌বার ছিল না। শেষে পেটের জ্বালায় পাড়াগাঁ ছেড়ে এই সহরে এসে তিনি তাঁ'র নারী-জীবনের সব জলাঞ্জলি দেন। আর-কিছু আমি জানি না।"

অলোক চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। নীরজাও নড়িল না, চড়িল না, অলোকের হাত-খানি কোলের উপর রাখিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে অলোক বলিল—"আচ্ছা নীরজা, ওই কি সত্যিই তোমার মা?"

নীরজা ভীত-চক্ষে একবার দরজার দিকে চাহিল—যদি তাহার মা আড়ালে দাঁড়াইয়া কাণ-পাতিয়া তাহার কথা শোনেন! যখন দরজার আড়ালে তাহার মায়ের অস্তিত্বের কোনো আভাষ সে পাইল-না, তখন মৃদু-কণ্ঠে বলিল—"তা' তো জানি না, তবে আমার কেবলই মনে হয় যে, আমার মা হ'লে কি উনি আমার ওপর অতো নিষ্ঠুর হ'তে পার্‌তেন!"

অলোক জিজ্ঞাসা করিল—"কেন উনি কি করেন?"

একটা মর্মস্পর্শী ব্যথার ছায়া নীরজার মুখের উপরে রেখায়-রেখায় ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল—"সে-সব কথা আপনার কাছে আর কি ব'লবো ? এই কুপথে চল্‌বার জন্যে প্রতিদিন কী গালা-গাল, কী উৎপীড়ন যে আমায় সইতে হয়, সে আপনি কি বুঝ্‌বেন ! এক-একবার মনে হয় আমার বাঁচ্‌বার দরকার কি, এ পোড়া জীবনটার শেষ ক'রে যেন এই জ্বালার হাত এড়াই ! কিন্তু সে-যে মহাপাপ, আবার যদি পরজন্মে এম্‌নি জ্বালায় জ্বলি, তাই ভয় হয়, পারি না।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নীরজার মুখের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অলোক বলিল—"যাবে নীরজা সংসারে ফিরে ?"

একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলিয়া ম্লানমুখে নীরজা বলিল—"তা' তো হ'তে পারে না, আমার দেহ-যে নষ্ট হ'য়ে গেছে।"

নীরজার ডান-হাতখানায় একটা নাড়া দিয়া অলোক বলিল—"দূর পাগ্‌লী ! প্রকৃতি যে পাকা গিন্নি, তা'র সংসারে কি কিছু নষ্ট হয় ! মূর্খ মানুষই নষ্ট করে, তাই তো তা'র এত দুঃখ, এত অভাব !"

অলোকের কথা নীরজা কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই জ্বালাময় জীবনের ঘৃণ্য আবেষ্টন হইতে মুক্তি পাইয়া কোনোদিন

যে এক সুখ-শান্তিময় সংসারের সুদূর কোণেও একটুখানি ঠাঁই সে পাইতে পারে, এ-দুরাশা তাহার মনে একটিবারও উদয় হইল না। তাই সে চুপ করিয়া মনে-মনে অশোকের কথার অর্থ খুঁজিতে লাগিল।

অলোক বলিল—"যাও নীরা, তোমার মা'কে ডেকে নিয়ে এসো, তাঁ'র সঙ্গে কথা কই। আমার ওপর বোধহয় তিনি বেজায় রেগে আছেন।"

নীরজা উঠিয়া শঙ্কিত-চিত্তে মানদাকে ডাকিয়া আনিতে গেল।

মানদা তখন বারান্দার শেষ-দিককার ঘরে মেজের উপরে আঁচল পাতিয়া বসিয়া, সামনে একটা আলো রাখিয়া, অলোকের নোট্-গুলা দুই-হাতে ফাঁক করিয়া আলোর সামনে ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছিল—সেগুলা জাল কি না। নীরজার পায়ের শব্দে তাড়া-তাড়ি নোট্গুলা কাপড়ের নীচে লুকাইয়া ফেলিয়া, পায়ের তলাটা আলোকের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিয়া, যেন কোনো বেঁধা কাঁটা অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

নীরজা আসিয়া ভয়ে-ভয়ে বলিল—"মা উনি তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

নোটের তাড়াটা পাইয়া মানদার মনটা তখন খোস্-মেজাজে

ছিল, তাই হাসিয়া রসিকতা করিল—"কেন লো, তোর অমন্ ডব্‌কা বয়সেও তা'র মন ম'জ্‌লো না! আবার আমার ডাক প'ড়লো কেন?"

মানদা ঘরে প্রবেশ করিতেই অলোক সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিয়া অকপট-চিত্তে বলিল—"এস মা, ব'সো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

বিস্মিতা মানদা আস্তে-আস্তে আসিয়া একটু দূরে বসিয়া জিজ্ঞাসু-নয়নে অলোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অলোক আব্দারের-কণ্ঠে বলিল—"মা, তুমি অর্থ-ঐশ্বর্য্য, ভোগ-বিলাস, জীবনে যা' চাও আমি তোমায় দোবো, আমি কেবল এই ভিক্ষাটুকু তোমার কাছে চাই যে, নীরজাকে তুমি কিছু বোলো না, ওকে তুমি মুক্তি দাও!"

সহসা অলোকের এই প্রস্তাবের কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া মানদা চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনে হইল— নিশ্চয়ই মিন্‌সেটার কোনো বদ্ মতলব আছে, তা' না হইলে হঠাৎ নীরজার উপর তাহার এত দরদ কেন, তাহার প্রতি এত বিনয়ই বা কেন! সে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে অলোকের মুখের উপর একবার

চোখটা বুলাইয়া লইল, কিন্তু অলোকের মতলবটা সে কিছুই ধরিতে পারিল না।

মানদাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অলোক সরিয়া আসিয়া তাহার পায়ে হাত দিয়া বলিল—"মা, ব্রাহ্মণ ব'লে আমি কোনো দিন অহঙ্কার ক'রিনি। কিন্তু তবু আমি ব্রাহ্মণ, তোমার পায়ে ধ'রে এই ভিক্ষা ক'রছি—নীরজাকে তুমি কিছু বোলো না, তোমার সব আকাঙ্ক্ষা আমি মেটাবো।"

মানদা শিহরিয়া উঠিবার মত করিয়া হাত-দুইটা জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—"কেন বাবা, ব্রাহ্মণের হাত আমার পায়ে দিয়ে আমায় পাপের ভাগী ক'রছো! নীরজা-মা'কে তো আমি এমন কিছুই বলি না, যা' একটু-আধটু মাঝে-মাঝে বলি, সে তা'রই ভালোর জন্যে। আমি তা'র মা, আমি না দেখ্‌লে, তা'র ভালো আর কে দেখ্‌বে! তা তুমি যদি ওকে বরাবর বাঁধা রাখ্‌তে চাও, ন্যায্য-মত দিলে, আমার কোনো আপত্তি নেই। এই বেলতলার মহারাজা মাসে একহাজার টাকা দর দিয়ে ক'দিন ধ'রে লোক পাঠাচ্ছে। সে একে তা'র বাগান-বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌তে চায়, তাই আমি রাজি হইনি।"

নীরজা এই নিছক মিথ্যা সাম্‌লাইতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—"কই মা, কেউ তো আসেনি !"

রাগে মানদার বুকের ভিতরটা টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল ওই মূর্খ মেয়েটার গলা টিপিয়া টুঁটিটা ছিঁড়িয়া দেয়, এমন-একটা মস্ত দাঁও মুঠার মধ্যে পাইয়াও সে কিনা ফস্‌কাইয়া দিতেছে ! কিন্তু অলোকের সম্মুখে তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা তো সম্ভব নয়, তাই একটা রুক্ষ ভ্রূকুটির বাণে নীরজাকে বিদ্ধ করিয়া, ঠোঁটের উপরে জোর করিয়া খানিকটা হাসি ফুটাইয়া বলিল—"তুই সে-কথা কি ক'রে জান্‌বি মা, তোর কাছে তো লোক পাঠায়নি, আমারই কাছে লোক পাঠিয়েছে !"

অলোক বেশ বুঝিল মানদার কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তবু সে আর অনর্থক কথা কাটাকাটি না করিয়া বলিল—"বেশ, হাজার-টাকাই দোবো, কিন্তু মনে রেখো সব জিনিষেরই একটা ক'রে সীমা আছে, সেইটা অতিক্রম ক'রলেই জগতে নানারকম অনর্থের সৃষ্টি হয় !"

মানদা চুপ করিয়া রহিল। ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া দশটা বাজিল। অলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আচ্ছা, আজকের মতন চ'ল্লুম !"

নীরজা দু'টি চক্ষু তুলিয়া বিদায়োন্মুখ অলোকের মুখের দিকে একবার চাহিল ; সে-চোখে কত আকুলতা, কত মিনতি, কত— !

৬

সারারাত্রি অলোকের ভাল করিয়া ঘুম হইল না। কেমন-যেন-একটা অস্পষ্ট অস্বস্তির ভাব থাকিয়া-থাকিয়া তাহার বিক্ষিপ্ত মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগিল। সকালে উঠিয়া তাহার মনে হইল—যেন কি-একটা অজ্ঞাত বাঁধন তাহার অবাধ জীবনের উপরে অতি ধীরে মোহজাল বিস্তার করিতেছে, যেন তাহার এতদিনকার মুক্ত হৃদয়ের কূলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে! সে মনে-মনে বলিল—বেশ ছিলাম, গায়ে পড়িয়া এ দায়িত্ব মাথায় লইবার কি দরকার ছিল! দুঃখ!—মানুষের দুঃখ যদি মানুষ ঘুচাইতে পারিত, তাহা হইলে এ রাশি-রাশি দুঃখ আসে কোথা হইতে!

কোঁচাটা খুলিয়া গায়ে জড়াইয়া, অলোক খালি-পায়েই বিজয়ের বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। বিজয় তখন সবেমাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া সাম্‌নে এক পেয়ালা চা লইয়া হাই তুলিতে-তুলিতে কি যেন ভাবিতেছিল। অলোকের পায়ের শব্দে একবার মুখ

তুলিয়া চাহিয়া, গম্ভীরভাবে চামচ্ দিয়া চা-টাকে খুব উদ্যমের সহিত ঘুঁটিতে লাগিল।

অলোক হাসিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বিজয়ের পাশে বসিয়া কহিল—"দেখো হে, অত ঘোঁটার চোটে পেয়ালাটা না ডিগ্‌বাজী খায়।"

বিজয় কোনো উত্তর না দিয়া, চায়ের উপরে যেন কি-একটা ভাসিতেছে, নিবিষ্ট-মনে উঠাইতে লাগিল।

অলোক বলিল—"বিজয়, কাল নীরজার কাছে গেছ্‌লুম, রাত্তির দশটা অবধি ছিলুম।"

বিজয় অলোকের দিকে না চাহিয়া তেমনই গম্ভীরভাবে বলিল—"বেশ!"

অলোক বলিল—"শুধু বেশ! অতক্ষণ কি ব'ললুম, কি ক'রলুম, একবার জিজ্ঞাসা ক'রলে না!"

বিজয় নির্ব্বিকারভাবে বলিল—"না।"

অলোক বলিল—"কেন?"

বিজয় বলিল—"জান্‌তে কৌতূহল নেই।"

অলোক হাসিয়া বলিল—"হঠাৎ একদিনের মধ্যেই কৌতূহল সব কোথায় পালালো?"

বিজয় বলিল—"মনের পরিবর্ত্তনটা সাধু মানুষদেরই তো আর একচেটে নয়!"

বিজয়ের মনের কোন্‌খানটায় যে কাঁটা বিঁধিয়া আছে, অলোক তাহা বেশ ভাল করিয়াই জানিত, বিজয়ের এই কথায় তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ পাইল।

অলোক বিজয়কে একটা মৃদু ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"আচ্ছা বেশ! এখন এই সাধু মানুষের একটা হুকুম তোমায় তামিল ক'রতে হবে।"

বিজয় এইবার মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

অলোক বলিল—"দুপুর-বেলাটা ঘুমিয়ে নষ্ট না ক'রে, তুমি রোজ গিয়ে নীরজাকে ছবি আঁকা শিখিয়ে আস্‌বে।"

বিজয় মনে-মনে হাসিল, তাহার বড় ইচ্ছা হইল একবার বলে —"কত মাইনে দেবে?" কিন্তু এত সহজে এ গাম্ভীর্য্য নষ্ট করা চলিবে না। সে বলিল—"সে ছেলে-বেলায় ছবি-টবি আঁক্‌তুম, এখন আর হাত নেই।"

অলোক বলিল—"ওসব বাজে কথা রেখে দাও! এই সে-দিনও তো "সদ্য-বিধবা"র ছবি এঁকে এক্‌জিবিষাণে সোণার মেডেল্ পেয়েছো। ওই শক্তিটা বিধাতা তোমায় দিয়েছিলেন,

যদি এম্‌নি কুঁড়ের মতন জীবনটা না কাটিয়ে, ওই জিনিষটার চর্চ্চা ক'রতে, তা'-হ'লে এতদিনে তুমি একটা মস্ত বড় আর্টিষ্ট্‌ হ'তে।"

বিজয় চুপ করিয়া রহিল।

অলোক বিজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলো ?"

বিজয় বলিল—"নীরজাকে আমার হাতে এমন ক'রে ছেড়ে দিতে তোমার ভয় হ'চ্ছে না ?"

অলোক দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল—"না, একটুও না ! এতদিনের অভিজ্ঞতায় এইটুকু বেশ বুঝেছি যে, চোরের হাতে লোহার-সিন্দুকের চাবি নির্ভয়ে তুলে দিলে, চুরি ক'রতে তা'র মনে দ্বিধা আসে ; নিঃসঙ্কোচে চুরি করে সেই, যা'র কাছ থেকে চাবি সরিয়ে-সরিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে রাখা হয় !"

বিজয় অন্যদিকে চাহিয়া কি মনে-মনে ভাবিতে লাগিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অলোক বলিল—"কি হে, অতো কি আকাশ-পাতাল ভাব্‌ছো ?"

বিজয় একটু যেন চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"আমায় মাপ করো ভাই অলোক, তোমার বিশ্বাস আমি নষ্ট ক'রতে পার্‌বো না।"

অলোক হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"বিশ্বাস নষ্ট ক'রতে যদি না চাও তো, কে তোমায় নষ্ট ক'রতে ব'লছে ?"

বিজয় বলিল—"তুমি যে-গুরুভার আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ, সে-ভার বহন কর্‌বার শক্তি আমার নেই, আমি দুর্ব্বল !"

অলোক বলিল—তা' হো'ক্, যদি এ-গুরুভারের চাপে কোনো-দিন হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ো, আমি হাত ধ'রে তোমায় ওঠাবো,—ক্ষমা ক'রবো, ঘৃণা ক'রবো না। তোমার কোনো ভয় নেই !"

বিজয় অলোকের মুখের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"সত্যি ?"

অলোক বলিল—"নিশ্চয়ই ! দুর্ব্বলতা জিনিষটা তো তোমার একচেটে নয় ! আর, একথা ভুলো না যে, যে-দুর্ব্বলতার পেছনে একটা খাঁটি আন্তরিকতা আছে, সে-দুর্ব্বলতার চেয়ে মানুষের আর বড় শিক্ষক নেই !"

বিজয় আর কিছু না বলিয়া অলোকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল—"আচ্ছা।"

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ করিয়া রহিল। তা'রপর বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা অলোক, ঠিক ক'রে বলো তো—নীরজার ওপর তোমার এত টান কেন।"

অলোক হাসিয়া বলিল—"তা'কে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।"

বিজয় বলিল—"ওসব বাজে কথা রেখে দাও! আমি প্রথমটা ভেবেছিলুন সত্যিই বুঝি নীরজার ওপর তোমার একটু অনুরাগ হ'য়েছে। কিন্তু তা'ই যদি হ'তো, তা'-হ'লে আমার মতন লোকের হাতে তা'কে এমন ক'রে নির্ভয়ে ছেড়ে দিয়ে, বেরালকে মাছ আগ্‌লাতে দিতে না।"

অলোক বলিল—"নীরজার ওপর আমার এ টানের কারণ তোমার কি মনে হয়?"

বিজয় বলিল—"কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।"

অলোক বলিল—"নীরজাকে দেখে আমার প্রথম মনে হ'য়েছিল—এই-যে এতগুনো নারীর কপালে বেশ্যা-নামের ছাপ দিয়ে, সমাজ ঘৃণা ক'রে চিরকালের জন্যে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, এতখানি মূলধন এমন ক'রে নষ্ট ক'রে সমাজের কী লাভ হ'চ্ছে! তাই আমি একবার দেখ্‌তে চাই—এই ছড়ানো মূলধনটাকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে জীবনের কারবারে লাগানো যায় কি না।"

বিজয় বলিল—"তুমি কি ব'লতে চাও যে, ওই বেশ্যাদের সমাজে তুলে নিয়ে তা'দের দিয়ে গৃহস্থের সংসার পাতা যায়?"

অলোক বলিল—"ঠিক তা'ই না-হ'লেও, অনেকখানি তা'ই। কারণ ভালো-জিনিষটা সংসারের একচেটে নয় এবং মন্দ-জিনিষটা কেবল ওই বেশ্যাদেরই জন্যে তৈরী হয়নি!"

বিজয় বলিল—"হাজারটা বেশ্যার মধ্যে একটা বেশ্যা না-হয় খাঁটি থাক্‌তে পারে, কিন্তু সেই একটাকে উদ্ধার করার মধ্যে কত বিপদ আছে, একবার ভাবো দিকিন্! কত চরিত্র তা'তে নষ্ট হ'তে পারে!"

অলোক বলিল—"তবু ক'রতে হবে—যত বিপদই থাক্, যত চরিত্রই নষ্ট হো'ক, তবু সেই একটাকেই বাঁচাতে হবে! মানুষ যদি হাজার-মণ ধূলো-মাটি ঘেঁটে পৃথিবীর অন্ধকার গর্ভ থেকে এক-রতি সোণা খুঁজে নিয়ে আস্‌তে পারে, তবে হাজারটা বেশ্যার মাঝখান থেকে কি একটা নারীকে উদ্ধার ক'রে আন্‌তে পারে না? প্রতিদিন মাটি চাপা প'ড়ে সোণার খনিতে কত-লোক তো প্রাণ হারাচ্ছে, তবু কি মানুষ সোণার লোভ ছেড়ে দেয়! কোনো বিপদের ভয় তো সেখানে থাকে না, আর যত ভয় কি ওই অভাগী নারী-জাতটারই বেলায়? জেনে রেখো বিজয়, হাজারটা ঝুটো পুরুষের চরিত্রের চেয়ে একটা সাঁচ্চা নারীর জীবনের দাম ঢের বেশী!"

বিজয় বলিল—"কি জানি, কিছু বুঝি না! আমি তো

এতদিন ধ'রে এই বেশ্যা-জাতটাকে দেখ্‌লুম, কিন্তু কই কোনো ভালো জিনিষের লেশমাত্র তো তা'দের মধ্যে দেখিনি, ভালো কিছু তা'দের মধ্যে আছে ব'লেও তো মনে হয় না!"

অলোক বলিল—"তা'র কারণ, তোমরা বেশ্যার কাছে যাও—কেবলমাত্র তোমাদের দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ কর্‌বার জন্যে। তোমরা চাও বেশ্যার দেহখানা, কিন্তু সেই জড়-দেহের রক্ত-মাংসের পেছনে বেশ্যার আর-কিছু আছে কি না, সে-সন্ধান কি তোমরা কোনোদিন ক'রেছ? যদি ক'রতে, তা'-হ'লে দেখ্‌তে যে, তা'দেরও হৃদয় ব'লে একটা জিনিষ আছে। অনেক ঘৃণা পেয়ে, অনেক ঘা খেয়ে, অনেক অমর্য্যাদার ভারে পিষে গিয়ে সে-হৃদয় অনেক সময়ে অসাড় হ'য়ে যায় বটে, তবু যদি স্নেহ দিয়ে, দরদ দিয়ে, করুণা দিয়ে তা'দের এই ঘুমন্ত নারী-হৃদয়কে নাড়া দাও, তা'-হ'লে নিশ্চয় জেনো, সে-হৃদয় একদিন-না-একদিন ঘুম ভেঙ্গে উঠে তোমায় সাড়া দেবেই দেবে! তোমরা বেশ্যার কাছে শুধু দেহ চাও, তাই দেহ পাও; হৃদয় চেয়ো, হৃদয় পাবে।"

অলোকের কথাগুলা বিজয়ের কাণে বড়ই অদ্ভুত ঠেকিল, সেগুলাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া সে কিছুতেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। বেশ্যার হৃদয়!—কই এতদিনের অভিজ্ঞতায়

সে-হৃদয়ের একটা অতি ক্ষীণ সাড়াও তো কোনোদিন সে পায় নাই! সে বেশ্যার মধ্যে দেখিয়াছে কেবলমাত্র স্থূল ভোগ-লালসার একটা আকণ্ঠ তৃষ্ণা,—প্রকৃতির প্রলয়-শক্তি যেন মূর্ত্তি লইয়া বেশ্যারূপে মানুষের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই বেশ্যার হৃদয়ের ইঙ্গিত অলোক কোথায় পাইল! এ-প্রশ্নের মাথা-মুণ্ড কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"অলোক, তোমার কি মনে হয় বেশ্যা যথার্থই কাউকে ভালবাস্‌তে পারে—সতী-স্ত্রীর মতন?"

অলোক বলিল—"নিশ্চয়ই! আমার মনে হয়, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে অলক্ষ্যে-গোপনে যেন একটা অতি কঠিন বাধ্য-বাধ্যকতার ভাব জড়িয়ে আছে। তা'রা দু'জনেই জানে যে, তা'রা ইচ্ছা ক'রলেই পরস্পরকে পরিত্যাগ ক'রতে পারবে না, একটা দুশ্ছেদ্য সামাজিক বন্ধন তা'দের দু'জনকে শক্ত ক'রে বেঁধে রেখেছে,—বিশেষতঃ আমাদের সমাজে। তাই তা'দের ব্যক্তিগত বৈষম্যগুনোকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব ক'রে এনে, তা'দের পরস্পরের সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে নিতে হয়; যেখানে তা'রা তা' পারে না, সেখানে আপনা-আপনি অনেক ভণ্ডামি, অনেক প্রতারণা এসে জোটে। কিন্তু কোনোরকম বাধ্য-বাধকতার ভাব বেশ্যা ও

পুরুষের ভালবাসাকে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখে না। তা'রা জানে যে, তা'রা দু'জনেই আবাধ, স্বাধীন,—যখন ইচ্ছে তা'রা পরস্পরকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে পারে। তাই তা'দের মধ্যে যদি যথার্থই একটা ভালবাসা থাকে, সে-ভালবাসা বড় খাঁটি, বড় মিষ্টি হয়,—সতী-স্ত্রীর ভালবাসার চেয়ে সে-ভালবাসা কোনো অংশেই হীন নয়!"

বিজয় বলিল—"তবে কি স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে সামাজিক সংস্কারের কোনো প্রভাব তুমি মানো না?"

অলোক বলিল—"খুব মানি! তাই বুঝ্‌তে পারি না যে, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার কতখানি প্রাণের টান, আর কতখানি সংস্কার!"

অলোকের কথা শুনিয়া বিজয় নিতান্ত অবাক হইয়া গেল, বলিল—"অলোক, আমি সত্যিই বুঝ্‌তে পারছি না—তুমি এত শিক্ষিত হ'য়ে কি ক'রে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র ভালবাসাকে এমন ছোট ক'রে দিচ্ছ।"

অলোক সস্মিত-মুখে বলিল—"না, তুমি ভুল বুঝেছ। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার যেটুকু সাঁচ্চা, তা'কে আমি একটুও ছোট ক'রছি না—ক'রতে পারি না! সে মহান-বিরাট ভালবাসার পায়ে

আমি চিরকালই মাথা নোয়াবো। কিন্তু আমি খালি এই কথাটা ব'লতে চাই যে, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাকে নিয়ে আমরা যতটা হৈ-চৈ করি, ঠিক ততখানি একটা বিরল জিনিষ ওটা নয়, বিবাহ-বন্ধনের বাইরেও খাঁটি ভালবাসা থাকতে পারে। মানুষের ইতিহাসে এমন-একটা দিন ছিল, যখন বিবাহ ব'লে কোনো জিনিষ ছিল না, কিন্তু তখনও পুরুষ নারীকে এম্নি ক'রে বুক ভ'রে ভালবাস্তো, তখনও নারী এমন ক'রে প্রাণ ঢেলে পুরুষের সেবা ক'রতো, তা'র জন্যে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব ভুলে যেতো। এই একনিষ্ঠ ভালবাসা আজ পর্য্যন্তও অনেক পশু-পক্ষীর মধ্যেও স্পষ্ট দেখা যায়!"

বিজয় বলিল—"তা'ই যদি হয় অলোক, তবে সমাজের এত আইন-কানুন, এত কড়া শাসনের দরকার কি?"

অলোক বলিল—"এত আইন-কানুন এই জন্যে যে, মানুষের মনের মাঝখানে একটা চিরকেলে পশু তা'র হিংস্র মূর্ত্তি মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তাই নিজের চারদিকে নানা বিধি-বিধানের বেড়া বেঁধে মানুষ সতর্ক হ'য়ে ব'সে আছে—যেন সেই পশুটা বেড়া ভেঙ্গে ঢুকে উৎপাত না ক'রতে পারে, আর-কিছুই নয়!"

এতক্ষণে অলোকের কথার অর্থ যেন কিছু-কিছু বিজয়ের

মাথায় ঢুকিল। সে বলিল—"তবে তো সমাজের এই-সব বিধি-বিধানগুনোকে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ব'ল্‌তে পারো না।"

অলোক বলিল—"সভ্যতার নাম দিয়ে এত অসংখ্য কৃত্রিমতার মায়াজালে মানুষ তা'র জীবনটাকে গুটিপোকার মতন জড়িয়ে ফেলেছে, যে এ-অবস্থায় এই-সব বিধি-বিধানকে এখন একেবারে অনাবশ্যক ব'লতে পারি না। কিন্তু মানুষ যদি তা'র মনের এই অপরাজেয় পশুটার সঙ্গে এইরকম চিরন্তন বিরোধের সৃষ্টি না ক'রে, তা'র সঙ্গে সন্ধি ক'রে, মিলে-মিশে তা'র সমাজ গ'ড়্‌তো, তা'-হ'লে আজ আগ্নেয়গিরির মতন এত অশান্তির আগুণ সমাজের বুকের ভেতর এমন ক'রে গুমে-গুমে উঠ্‌তো না। আমার কি মনে হয় জানো বিজয়! আমার মনে হয় যে, পাপ জিনিষটাকে প্রকৃতি তৈরী ক'রেছিল বটে, কিন্তু তা'কে এতটা কুৎসিত, এতখানি প্রবল ক'রে গড়েনি। মানুষই তা'র নৈতিক গোঁড়ামি দিয়ে তা'কে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে এতখানি হিংস্র-ভীষণ ক'রে তুলেছে। কোনো গোঁড়ামিই কোনোদিন মানুষকে বড় হ'তে দেয় না—ছোটই ক'রে রাখে। সমাজ-সংস্কারের প্রথম কাজই হ'চ্ছে, এই নৈতিক গোঁড়ামিকে সমাজ থেকে ধুয়ে মুছে ফেলা।"

কথায়-কথায় অনেক বেলা হইয়া গিয়াছিল। অলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"আর ব'সলে চ'লবে না, আমায় কলেজ যেতে হবে। আমি চ'ল্‌লুম্‌, যা' ব'ল্‌লুম্‌ তা' মনে রেখো বিজয়! আমি আজ সন্ধ্যাবেলা একবার সেখানে গিয়ে সব ঠিকঠাক ক'রে আস্‌বো, তুমি কাল থেকে তোমার কাজ আরম্ভ ক'রবে।"

অলোক উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

৭

দুপুর-বেলা আহারাদির পর নীরজা তেতলার ঘরে বসিয়া একখানা সূর্য্যাস্তের অর্দ্ধ-সমাপ্ত ছবির উপরে তুলি বুলাইতেছিল। ছবিখানির রেখাগুলি কাল বিজয় টানিয়া দিয়া গিয়াছিল। এক নিরালা-নির্জ্জন বনান্তরালে সূর্য্যাস্তের ছবি—একটি ছোট পার্ব্বত্য নদী বনের গা ঘেঁসিয়া চলিয়াছে—একেলা, লক্ষ্যহারা উল্কার মত। তাহার একদিকে দিগন্ত-প্রসারিত উদাস প্রান্তর, অপরদিকে স্তব্ধ-ধূসর বনচ্ছায়া; সেই বনের সুদূর প্রান্তে সায়াহ্নের ম্লান সূর্য্য ধীরে-ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে; নদীর থরস্রোতে তাহার শেষ আভাটুকু কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছিল। নীরজা তন্ময়চিত্তে সেই

নীল সন্ধ্যাকাশে অস্তরবির বিদায়-ব্যথাটিকে যেন তাহার হৃদয়ের রক্ত-রাগে রাঙ্গিয়া তুলিতেছিল।

সহসা কে-একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে অতি কুণ্ঠিত-চরণে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া আর্ত্ত-কণ্ঠে বলিল—"দিদি, আমায় চার-আনা পয়সা দেবে? আমার ছেলের জন্যে ওষুধ আন্‌বো—।" এইটুকু বলিতেই অবরুদ্ধ আবেগে তাহার গলাটা জড়াইয়া আসিল।

নীরজা মুখ ফিরাইয়া দেখিল—তাহার পাশের বাড়ীর ভাড়াটে সুলোচনা। পরণে তাহার এক অতি জীর্ণ ময়লা কাপড়, চুলগুলি রুক্ষ বিপর্য্যস্ত, মুখখানা শীর্ণ, ম্লান। কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাভাবে সে তাহার একজোড়া সোনার-মাক্‌ড়ী কাণ হইতে খুলিয়া নীরজার মা'র কাছে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। সেই-সময়ে তাহার সঙ্গে নীরজার প্রথম আলাপ হয়। সেই হইতে সমবেদনার অশ্রু-জলে এই দুইটি সমাজ-বঞ্চিতা হতভাগিনীর অন্তরে পরস্পরের প্রতি একটা নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক নীরবে-নির্জ্জনে ধীরে-ধীরে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

নীরজা অনুযোগের স্বরে বলিল—"তোর এখনও এক-মাস হয়নি, আর তুই এম্‌নি ক'রে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিস্! আবার শুন্‌লুম তোরও রোজ ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হ'চ্ছে!"

সুলোচনা বলিল –"কি ক'রবো ভাই! আমার যে আর একটা কাণা-কড়িও নেই, যা'-কিছু ছিল সবই বিক্রি হয়ে গেছে; সবাইয়ের কাছে চেয়েছি, কেউ একটা পয়সা ধার পর্য্যন্ত দিলে না। তাই একবার ধুঁকৃতে-ধুঁকৃতে এলুম্ তোমার কাছে, তোমার সিঁড়িতে উঠ্‌তে তিনবার ব'সে জিরিয়েছি।"

নীরজা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সে-সয়-তানের কাছে লোক পাঠাবি ব'লেছিলি, কি হ'লো?"

সুলোচনা বলিল—"কা'কে পাঠাবো ভাই! কাকুতি-মিনতি ক'রে অতোগুনো চিঠি লিখ্‌লুম, ব'ললুম দু'টীমাত্র টাকা দিলেও আমার ছেলেকে ডাক্তার দেখাই। তিনি তা'র একখানারও জবাব দিলেন না। তাই ভাব্‌লুম যদি নিজে গিয়ে তাঁ'র পায়ে কেঁদে পড়ি, তা'তে যদি একটু দয়া হয়, তাঁ'রও তো ছেলে—।" সুলোচনা আর বলিতে পারিল না।

নীরজা জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'লো?"

অশ্রু-রুদ্ধ-কণ্ঠে সুলোচনা বলিল—"কি-আর হবে ভাই!"

নীরজা বলিল—"দরোয়ান দিয়ে দূর ক'রে দিলে ত?"

সুলোচনা কোনো উত্তর দিল না, মেজের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

নীরজা বলিল—"একবার দেখাও ক'রলে না?"

সুলোচনা বলিল—"না।"

মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, নীরজা ধরা-গলায় বলিল—"হতভাগী, কেন এমন ক'রে জ্ব'লে ম'রতে তা'র কথা শুনে বেরিয়ে এসেছিলি!"

সুলোচনা কিছুই বলিল না, তাহার দু'টি শীর্ণ-পাণ্ডুর গাল বাহিয়া বড়-বড় অশ্রুর ফোঁটা টস্-টস্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ করিয়া রহিল। কেমন-যেন-একটা মৌন বেদনার থম্‌থমে ভাব ঘরখানাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। নীরজা খোলা জানালার ভিতর দিয়া হেমন্তের ধূসর আকাশের পানে আনমনে চাহিয়া রহিল, আর তাহার সম্মুখে অপরাধিনীর মত দাঁড়াইয়া সুলোচনা যেন দণ্ডাদেশের প্রতীক্ষায় নীরজার মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ এইভাবে নিঃশব্দে কাটিবার পর সুলোচনা ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল—"ভাই, দয়া ক'রে আমায় চারটি-আনা পয়সা দাও, আমি ওষুধ আনি।"

একটা বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরজা বলিল—"ভাই,

আমার অবস্থা তো তুই সব জানিস্, আমার হাতে তো একটা আধ্‌লাও নেই, কোথেকে চার-আনা পারো ভাই !"

অশ্রু-বিগলিত-নয়নে নীরজার পায়ের কাছে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িয়া সুলোচনা বলিল—"তা'-হ'লে আমার কি হবে দিদি ? ডাক্তারবাবু ব'লেছেন এখনই ওষুধ না দিলে সন্ধ্যার মধ্যে আমার বাছা আমায় ছেড়ে চ'লে যাবে !"

নীরজা সুলোচনার দুই-হাত ধরিয়া উঠাইয়া সান্ত্বনার-স্বরে বলিল—"আচ্ছা, তুই এখন বাড়ী যা', আমি এখনই তোর ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। যা', দেরী করিস্‌নি !"

নিরুপায়া সুলোচনা চোখ মুছিয়া ক্লান্ত-চরণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নীরজা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল—কি করা যায় !

•

হঠাৎ নীরজা হাত হইতে একগাছা সোণার-চুড়ী খুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া সুলোচনাকে বলিল—"ততক্ষণ এই চুড়ীটা ডাক্তার-খানায় বাঁধা রেখে ওষুধ নিয়ে আয়, তা'রপর আমি বন্দোবস্ত ক'রছি।"

সুলোচনা চুড়ীটা গ্রহণ না করিয়া বলিল—"না ভাই, ও তুমি রেখে দাও, তোমার মা জান্‌তে পার্‌লে তোমায় গাল দেবে,

মার্‌বে ; আমার কপালে যা' আছে, তা'ই হবে।" এই বলিয়া সুলোচনা আর অপেক্ষা না করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

নীরজা ফিরিয়া আসিয়া তাহার ছবিখানার সাম্‌নে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভার উপর কে যেন রাত্রির কালো অন্ধকার লেপিয়া দিল! সে ভাবিতে লাগিল—কী দুর্ভাগ্য নিরুপায় জীবন তাহার! এক অভাগিনী নারী, কত-না অভাবে, কত-না দুঃখে, তাহার কাছে দুই-হাত পাতিয়া মাত্র চারিটা আনা পয়সা মাগিয়া তাহার শিশুর জীবন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তা'ও সে দিতে পারিল না!—ধিক্!—শত ধিক্ তাহার জীবনে!!

নীরজা এতই তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল যে, কখন-যে বিজয় আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে জানিতেই পারে নাই। চমক ভাঙ্গিতেই বিজয়ের কণ্ঠস্বর তাহার কাণে গেল—"অমন ক'রে কি ভাব্‌ছো নীরজা?"

নীরজা এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া অতি কুণ্ঠিত-সঙ্কুচিত-ভাবে বিজয়কে বলিল—"আমায় দয়া ক'রে চার-আনা পয়সা দেবেন?"

বিজয় মূঢ় বিস্ময়ে নীরজার ব্যাকুল মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নীরজার এ কাতর আবেদন তাহার কাছে একটা দুর্ব্বোধ্য রহস্যের

মত ঠেকিল। আজ তিন-মাসের উপর হইল, প্রতিদিন আসিয়া সে নীরজাকে ছবি-আঁকা শিখাইতেছে। এই দীর্ঘ তিনটা-মাস তাহার সসম্ভ্রম আচরণ সত্ত্বেও কেমন-যেন-একটা একটানা ত্রস্ত-কুণ্ঠিত ভাব বরাবরই নীরজাকে তাহার কাছ হইতে দূরে-দূরে রাখিয়াছে। নীরজার এই ঔদাসীন্যে সে মনের মধ্যে কত দুঃখ পাইয়াছে, কত লজ্জা পাইয়াছে। কিন্তু নীরজার সঙ্গে তাহার পরিচয়ের সেই প্রথম দিনগুলার কদর্য্যতা মনে করিয়া, সে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে সাহস করে নাই। আজ যদি সে বলে যে, নীরজার প্রতি তাহার সেই ক্ষুধিত ভাব আর নাই, তাহার স্থানে আজ একটা নিঃশব্দ শ্রদ্ধার ভাব তাহার মনে বিরাজ করিতেছে, —সে কথা নীরজা কি করিয়া বিশ্বাস করিবে! তাই মনের ব্যথা মনে চাপিয়া বিজয় প্রতি মধ্যাহ্নে আসিয়া অলোকের কাছে তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিত। আজ পর্য্যন্ত একটা দিনের জন্যও কোনো অনুরোধ, কোনো আব্‌দার নীরজা তাহার কাছে করে নাই। আর আজ হঠাৎ কেন-যে সে তাহার কঠিন ঔদাসীন্যকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, নিতান্ত আত্মীয়ের মত এমন করিয়া তাহার কাছে চাহিল,—তা'ও সামান্য চারিটি আনা পয়সা,—তাহার তাৎপর্য্য বিজয় বুঝিয়া উঠিতেই পারিল না।

বিজয় স্নেহার্দ্র-স্বরে বলিল—"কি ক'রবে নীরজা, সামান্য চার আনা পয়সা নিয়ে?"

নীরজা বলিল—"আমার একটা বিশেষ দরকার আছে, এখনই চাই, দেবেন?"

বিজয় বলিল—"নিশ্চয়ই দোবো! কিন্তু কি দরকার, সেটা কি আমায় বল্‌বার নয়?"

নীরজা একটু ভাবিয়া বলিল—"ব'লতে পারি, কিন্তু সে-সব শুনে আপনি অবজ্ঞার হাসি হাস্‌বেন।"

বিজয় বলিল—"না নীরজা, অলোকের কাছ থেকে এই বড় সত্য শিখেছি যে, মানুষের জীবনে অবজ্ঞা কর্‌বার কিছু নেই।"

নীরজা সুলোচনার দাবদগ্ধ জীবনের কাহিনী বিজয়কে বলিতে লাগিল:—'বর্দ্ধমান জেলার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-ঘরের মেয়ে সে, আট বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া, সাড়ে-আট বৎসর বয়সে বিধবা হয়; তাহার প্রস্ফুট যৌবনে গ্রামের জমীদারের চরিত্রহীন পুত্রের লুব্ধ দৃষ্টি তাহার উপর পড়ে; কত প্রেম সেই ধনীর-পুত্র তাহাকে নিবেদন করে। অবশেষে একদিন তাহারই প্ররোচনায় সরল বিশ্বাসে সে গৃহত্যাগ করে। তা'রপর পূর্ণ একটি বৎসর ধরিয়া

সে-অভাগিনীর যৌবনোচ্ছ্বসিত দেহখানি উন্মত্ত লালসার পঙ্কে আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখিয়া, যখন সেই জমীদারের কৃতী পুত্র একদিন জানিতে পারিল যে, সে তিন-মাস অন্তঃসত্ত্বা, তখন লোক-নিন্দা ও জারজ শিশুকে প্রতিপালনের ভয়ে, একদিন রাত্রে কিছু না বলিয়া সুলোচনার সমস্ত গয়না ও টাকা-কড়ি পকেটে পূরিয়া বুদ্ধিমানের মত সে সরিয়া পড়ে। যখন সুলোচনার উদ্ভ্রান্ত মোহের মিথ্যা-আবরণ এম্‌নি নিষ্ঠুরভাবে খসিয়া গেল, যখন ভ্রষ্ট নারী-জীবনের কঠোর সত্য বীভৎস মূর্ত্তি মেলিয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া একটা ক্রূর হাসি হাসিল, তখন কতদিন সে খানিকটা আফিম গিলিয়া সব জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছে, কিন্তু পেটে-যে তাহার সন্তান,—সে-যে তখন মা! তা'রপর ঘটি-বাটি, বিছানা-পত্র যাহা-কিছু ছিল, সবই একে-একে বিক্রয় করিয়া, লোকের কাছে ধার-ধোর করিয়া, ভিক্ষা করিয়া, এই সুদীর্ঘ ছয়-সাত মাস সে অতি কষ্টে, অতি দুঃখে চালাইয়াছে, এই গলির ধারে খুব কম-ভাড়ায় একখানা অতি জীর্ণ খোলার-ঘর ভাড়া লইয়া দিনের পর দিন তাহার অসহায় জীবন সে নীরবে-নির্জ্জনে কাটাইয়াছে। দুরবস্থার চরম সীমায় দাঁড়াইয়া নিতান্ত নিরুপায়া সে, কত কাকুতি-মিনতি করিয়া সেই ধনীর পুত্রের কাছে কেবলমাত্র পেটটা

ভরাইবার ছু'-মুঠি অন্ন ও মাথাটা গুঁজিবার একটুখানি ঠাঁই ভিক্ষা করিয়া চিঠি লিখিয়াছে, কিন্তু একখানা চিঠিরও কোনো উত্তর আসে নাই। আজ প্রায় এক-মাস হইল, সে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছে। জন্ম হইতেই ছেলেটা অসুখে ভুগিতেছে, কিন্তু যে খাইতে পায় না, সে কি করিয়া ডাক্তার আনিয়া ছেলের চিকিৎসা করিবে! কাল যখন শিশুর গুরুতর অবস্থা মা'র চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া ফুটিয়া উঠিল, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া, ছুর্ব্বল-ক্ষীণ দেহে সেই পঁচিশ-দিনের শিশুকে বুকে করিয়া গলির মোড়ে ডাক্তারের কাছে লইয়া গিয়া দেখাইল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন অসুখ খুব খারাপ, শীঘ্র ঔষধ না দিলে শিশুর মৃত্যু নিশ্চিত। সুলোচনা ডাক্তারকে তাহার ছুর্দ্দশা জানাইলে তিনি বলিলেন যে, ঔষধের খরচা কেবলমাত্র চার-আনা দিলেই তিনি দয়া করিয়া ঔষধ দিতে পারেন। কাঁদিতে-কাঁদিতে সুলোচনা তাহার জীর্ণ খোলার-ঘরে ফিরিয়া আসিল। রাত্রে উঠিয়া তাহার পীড়িত শিশুকে একেলা ফেলিয়া টলিতে-টলিতে সে সেই জমীদার-পুত্রের ছুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল—চারি-আনা পয়সা ভিক্ষা করিতে! জমীদার-পুত্র তখন দোতলার ঘরে বসিয়া মোসাহেব-পরিবেষ্টিত হইয়া মদ্যপান করিতেছিলেন। দরোয়ান

আসিয়া খবর দিতেই মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া গিয়া তিনি হুকুম করিলেন—কোই পাগলী হোগা, গর্দ্দান্ পাকড়্কে নিকাল্ দেও!

বিজয় কাণ পাতিয়া নীরজার কথাগুলি সব শুনিল। তাহার মনে হইল—সেও তো এমনি কতগুলি নিরীহা বালিকার মুগ্ধ চক্ষের সম্মুখে পরিপূর্ণ জীবনের একটা রঙীন ছবি মেলিয়া ধরিয়া, সংসারের বৃন্ত হইতে তাহাদের ছিঁড়িয়া আনিয়া, পরিশেষে একদিন ভোগের অবসানে তাহাদের অকূল-পাথারে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, আর একটিবারও তাহাদের পানে ফিরিয়া চাহে নাই! আজ তাহারা কোন্ দুর্দ্দশার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কিভাবে ডুবিয়া মরিতেছে কে জানে! সে-সকল কথা যদি নীরজা শোনে, তাহা হইলে বিজয়ের প্রতি তাহার ঘৃণা কত-গুণই না বাড়িয়া যাইবে! বিজয় মনে-মনে ঠিক করিল—সে প্রাণ দিয়া এই আশাহতা বালিকাকে বাঁচাইবে! তাহার এই অপচয়িত জীবনে একটিও ভাল কাজ করিবার এই-যে একটা সুন্দর সুযোগ সে আজ পাইয়াছে, সে-সুযোগ সে কিছুতেই হারাইবে না! সে শুষ্ক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"তা'র বাড়ীটা কোন্খানে?"

নীরজা কৃতজ্ঞ-চিত্তে বিজয়কে জানালার কাছে আনিয়া আঙ্গুল দিয়া সুলোচনার ঘরটা দেখাইয়া দিল।

বিজয় উত্তেজনার ঝোঁকে নীরজার ডান-হাতখানা ধরিয়া অনুনয়ের-স্বরে বলিল—"নীরজা, আমি যাচ্ছি, যতদূর সম্ভব তা'র জন্যে ক'রবো! কিন্তু তুমি সুলোচনার কথা অলোককে একেবারে বোলো না, এ-অনুরোধটা আমার রেখো!" আর কিছু না বলিয়া, নীরজার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিজয় ব্যগ্র-চরণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৮

বিকালে অলোক তাহার বাড়ীর নির্জ্জন ছাদে একেলা পায়-চারি করিতেছিল এবং ভাবিতেছিল নীরজার কথা। যেদিন সে বিজয়ের পাল্লায় পড়িয়া প্রথম নীরজার সংস্পর্শে আসে, সেদিন কেবলমাত্র একটা নিছক করুণার ভাব ছাড়া আর-কোনো ভাব তাহার মনে জাগে নাই। সেদিন বাড়ী ফিরিয়া তাহার শুধু এই কথা মনে হইয়াছিল—এই-যে সমাজের ঘৃণিতা মেয়েটা তাহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে, এমন করিয়া একটা পঙ্কিল জীবন দিনের-পর-দিন যাপন করিতেছে, এ যদি ইহা হইতে মুক্ত হইতে চাহে, তবে মুক্তি কেন সে পাইবে না! এই উদ্দেশ্যেই মাসে এক

হাজার টাকা খরচ করিয়াও, নীরজাকে বাঁধা রাখিবার ছল করিয়া, সে তাহাকে একটুখানি শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল। তা'রপর একদিন হঠাৎ যখন সে অনুভব করিল তাহার প্রাণের মধ্যে কে-যেন-একটা ঘুমন্ত মানুষ জাগিয়া উঠিয়া নীরজার পানে উৎসুক নয়নে চাহিতেছে, সেদিন একটা অস্পষ্ট অস্বস্তির ভাব তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার মনে হইয়াছিল যেন একটা কঠিন বাঁধন তাহার মুক্ত জীবনটাকে শত বন্ধনে বাঁধিতে আসিতেছে। তাই নীরজাকে ছবি আঁকা শিখাইবার ছুতা করিয়া, বিজয়কে সে তাহাদের দু'জনের মাঝখানে টানিয়া আনিয়া নিজে একটা দেওয়ালের আড়ালে থাকিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে যখন একদিন তাহার বক্ষের চিরপুরুষ তাঁহার প্রাপ্যের দাবী করিল, যখন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গে নীরজার নম্র-মধুর নারী-প্রকৃতি, তাহার স্নিগ্ধ-পেলব যৌবন-শ্রী, তাহার ব্যথিত-করুণ জীবন-ধারা অলোকের নির্লিপ্ত-উদাস অন্তরের উপর ধীরে-ধীরে একটা মুগ্ধ স্বপ্নের মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিল, তখন তাহার মনে হইল এ-বাঁধন তো খাঁচার বাঁধন নয়,—এ-যে দেহের মাঝে প্রাণের বাঁধন, স্রোতের পরে তরীর বাঁধন, ঝড়ের দিনে নীড়ের বাঁধন! যুগে-যুগে এই-বাঁধনই তো মানুষ চাহিয়াছে,

মানব-জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা, সমস্ত আনন্দ এই-বাঁধনেরই আড়ালে তো লুকাইয়া রহিয়াছে !

সেই হইতে নীরজার চিন্তা, নীরজার ধ্যান তাহার মৌন-অসাড় অন্তরের মাঝে কেমন-একটা গভীর চেতনার সঞ্চার করিয়া দিত। শত কাজের মধ্যে সারাটা-দিন তাহার প্রাণ-মন উন্মুখ হইয়া থাকিত সন্ধ্যার প্রতীক্ষায়—কখন একটা নিশ্চিন্ত অবসরে সে নীরজাকে কাছে পাইবে, কখন তাহার বক্ষের সদ্য-সুপ্তোত্থিত প্রেম সে তাহার ব্যাকুল নয়নের বিহ্বল দৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহাকে নিবেদন করিয়া দিবে, কখন সন্ধ্যার স্তব্ধ-শান্ত মিলন-ক্ষণে তাহার উৎসবের দেওয়ালি জ্বলিয়া উঠিবে !

আজও এম্‌নি-একটা স্বপ্নাবেশ অলোকের নিঃসঙ্গ সায়াহ্নের নিরালা অবকাশটাকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। দিনান্তের ক্লান্ত আলো ধীরে-ধীরে সন্ধ্যার আঁধার-কোলে ঘুমাইয়া পড়িল, কর্ম্মশ্রান্ত ধরণীর অবসন্ন শিয়রের কাছে তারকাময়ী রাত্রি তাহার ঘনকৃষ্ণ অঞ্চলখানি বিছাইয়া দিল। অলোক ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া পুলকিত-চিত্তে নীরজার কাছে চলিল।

সন্ধ্যার দীপটি জ্বালিয়া নীরজা বসিয়াছিল—অলোকের মৌন প্রতীক্ষায়। আজ কয়-মাস হইল, অলোক নীরজার কাছে

আসিতেছে। কত নিরালা মুহূর্ত্ত তাহার কাটিয়াছে—অলোকের সঙ্গে! কত আশা, কত আশঙ্কা, একই সঙ্গে তাহার ওই বুক-খানার মধ্যে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এক-একবার মনে হইয়াছে—অলোক যদি সত্যই তাহার প্রতি করুণা করিয়া তাহাকে এমন করিয়া চরণে একটুখানি ঠাঁই দেয়, তবে সারাজীবনের পরিপূর্ণ প্রেম দিয়া কি সে তাহার অতীত-জীবনের কালীটুকু মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না! আবার পরক্ষণেই মনে হইয়াছে—হায় দুরাশা! বেশ্যা-নামের অক্ষয় টীকা কপালে পরিয়া কোন্ সুখের আশা সে করিতে পারে! বেশ্যার প্রেম!—কে তাহা বিশ্বাস করিবে, মর্য্যাদা তাহার কোথায়! এম্‌নি-একটা অবিশ্রান্ত সংশয়ের দোলা এই কয়-মাস ধরিয়া তাহার ক্ষুব্ধ অন্তরটাকে দোল দিয়াছে। কিন্তু এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর সে আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই—নিজের কাছ হইতে নয়, অলোকের কাছ হইতেও নয়! আজ দুপুর-বেলা হঠাৎ দুঃখিনী সুলোচনা আসিয়া তাহার এ-প্রশ্নটাকে আরও জটিল করিয়া দিয়াছে। সন্ধ্যার দীপালোকে একটা তাকিয়ার উপরে বুকের ভর দিয়া নীরজা তাই ভাবিতে-ছিল—অলোকের সঙ্গে তাহার এই পরিচয়ের শেষ কোথায়—কোন্‌খানে!......

ছিন্ন-তার

ধীর পদক্ষেপে অলোক প্রবেশ করিল। নীরজা সসম্ভ্রমে উঠিয়া ভক্তিভরে গলায় আঁচল দিয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। অলোক দুই-পা পিছাইয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল—"দ্যাখো নীরজা, এম্‌নি করে প্রতিদিন আমার পায়ে মাথা নুইয়ে, তুমি নিজেরও অপমান করো, আমারও অপমান করো।"

নীরজা কিছু বলিল না।

নীরজার মুখের দিকে চাহিতেই অলোকের মনে হইল, নীরজার বুকখানা আজ যেন অন্যদিনের মত তেমন উচ্ছ্বসিত আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল না, ওই স্মিত নয়নের উৎসুক দৃষ্টি আজ যেন তাহাকে তেমন করিয়া অভিনন্দন করিল না! অলোক ঠিক বুঝিতে পারিল না ইহা ঠিক, না, ভুল। তাই এ সন্দেহটাকে মনের মধ্যে প্রশ্রয় না দিয়া, সে অন্য-দিনের মত হাসিয়া নীরজার কাছে গিয়া হাত-পা ছড়াইয়া সটান্ চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু আজ তাহারও মনের মধ্যে কেমন-যেন-একটা গাম্ভীর্য্য থাকিয়া-থাকিয়া উঁকি মারিতে লাগিল, তাহার মুখের উপরে সেই হাল্‌কা-চঞ্চল হাসি আজ তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিল না।

অনেকক্ষণ দুই-জনেই চুপচাপ রহিল, দুই-জনেরই বাক্‌শক্তি যেন লোপ পাইয়াছিল।

নীরজা পাশে বসিয়াছিল। অলোক এক-হাতে তাহার কটিতট বেষ্টন করিয়া, অপর হাতে তাহার একখানি হাত টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের উপরে রাখিয়া বলিল—"নীরজা, কত দিন ধ'রে কত কথা তোমায় ব'লবো-ব'লবো মনে ক'রছি, কিন্তু বলা আর হ'চ্ছে না, সে-সব কথা মনের মধ্যে প্রতিদিন জ'মেই উঠ্‌ছে।"

নীরজা কুণ্ঠিত চোখ-দু'টি নত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অলোক বলিল—"আমার এই লক্ষ্মীছাড়া জীবনটার সঙ্গে যদি তোমার জীবনটিকে জ'ড়িয়ে দিই, তা'-হ'লে কি তুমি আমায় ক্ষমা ক'রবে না ?"

এ কি কথা ! নীরজার মুখখানা লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কি-যে সে বলিবে ঠিক করিতে পারিল না !

নীরজার আনত মুখের উপরে পিয়াসী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অলোক বলিল—"বলো নীরজা !"

নীরজার রুদ্ধ-কণ্ঠ দিয়া যেন কোনো স্বর বাহির হইতে চাহিল না। যে উদ্দাম তরঙ্গ-পুঞ্জ অলোকের বুকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা নীরজার চিত্ত-সৈকতে শতধারে ছড়াইয়া

পড়িতে লাগিল। সে অনেক কষ্টে বলিল—"কিন্তু—।" এইটুকু বলিয়াই সে থামিয়া গেল।

অলোক আঙ্গুলের প্রান্ত দিয়া মৃদু সোহাগ-পরশে নীরজার চিবুকটি তুলিয়া ধরিয়া আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"কি তোমার মনে হচ্ছে, আমায় খুলে বলো নীরা, কোনো লজ্জা কোরো না।"

একটা কঠিন চেষ্টায় নিজেকে সচেতন করিয়া তুলিয়া নীরজা বলিল—"দু'দিন পরে যখন আপনার সাধ মিটে যাবে, তখন আমায় ঘৃণা ক'রে ফেলে চ'লে যাবেন। ভোগের-প্রভাতে দু'টো-দিনের জন্যে আমায় সুখের স্বর্গে তুলে দিয়ে, একদিন তৃপ্তির-সন্ধ্যায় দিশাহারা অন্ধকারে ছুঁড়ে দিয়ে কেন আমার দুঃখ বাড়াবেন! তা'র চেয়ে ঘৃণার-জিনিষ আমি, আমায় একটানা ঘৃণাই ক'রুন। তা' তবু সইতে পার্‌বো, কিন্তু দু'দিনের ভালো-বাসা যে কিছুতেই সইতে পার্‌বো না!"

অলোক তেমনি সোহাগ-ভরা-কণ্ঠে বলিল—"এ-ভয় তোমার কেন হচ্ছে নীরা?"

এ-ভয় তাহার কেন হইতেছে! এ-ভয় যে তাহার অন্তরের মজ্জায়-মজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে! নীরজার বড় ইচ্ছা হইল একবার অলোককে বলে—আজই দুপুর-বেলা এই-ভয় মূর্ত্তিমান

হইয়া তাহার শঙ্কাকুল চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে কী বীভৎস, কী ভয়ঙ্কর! কিন্তু বিজয় অমন করিয়া অনুরোধ করিয়াছে, তাই সুলোচনার বিদীর্ণ জীবন-কাহিনী নীরজা অলোককে কিছুই বলিতে পারিল না। সে কেবলমাত্র বলিল—"এ-ভয় যে উঠ্‌তে-ব'স্‌তে চোখের সাম্‌নে প্রতিদিন দেখ্‌ছি! এই-যে শত-শত হতভাগিনী আজ পাঁকের ওপরে প'ড়ে র'য়েছে—যা'দের আপনারা মনে-মনে কত ঘৃণাই-না করেন—তা'দের বেশীর ভাগেরই এই দুর্গন্ধ জীবনের পেছনে কি একটা মেকী ভালোবাসার ইতিহাস নেই?"

অলোক বলিল—"নীরা, তুমি যা' ব'লছো তা' সম্পূর্ণ ঠিক! কিন্তু সব পুরুষের মন তো এক ছাঁচে গড়া নয়, একই মাপকাঠিতে যদি তা'দের মাপ্‌তে যাও, তা'-হ'লে তা'দের ওপর অতি অন্যায় অবিচার করা হবে।"

নীরজা চুপ করিয়া রহিল। একদিকে অলোকের অকপট প্রেম-নিবেদন, অপরদিকে সুলোচনার জ্বলন্ত জীবনে পুরুষের নির্ম্মম হৃদয়-হীনতার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি,—এই-দুইটি পরস্পর-বিরোধী বিরাট শক্তির প্রচণ্ড সংঘর্ষে আজ তাহার মনের মধ্যে সব ওলট্‌-পালট্ হইয়া গিয়াছে, কোনো কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার

মত চিন্তা-শক্তি যেন তাহার নাই। তাই সে সব তর্ক, সব বিচারকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া, নিঃশব্দে অলোকের কথাগুলি মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

অলোকও নীরজার উন্মনা মুখের পানে তৃষিত নয়নের দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ এমনি নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। যে অপূর্ব্ব পুলক রুদ্র ছন্দে অলোকের বুকের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা যেন ওই ছোট্ট বুকখানার মধ্যে বাঁধা থাকিতে চাহিতেছিল না।

অলোক দুই বাহু প্রসারিত করিয়া মৃদু আকর্ষণে নীরজার হাল্‌কা দেহখানি বুকের উপরে টানিয়া আনিয়া, নিজের গালের উপরে তাহার লজ্জারক্ত গালটি রাখিয়া, মাতালের মত আবেগ-জড়িত-কণ্ঠে বলিল—"নীরা আমার, এই বুকের ওপরেই তোমার চিরদিনের আসন, এখান থেকে তোমায় নাম্‌তে দোবো না!" তা'রপর নীরজার কমল-কোরকের-মত মুখখানি দুই-হাতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার চূর্ণ-কুন্তল-শোভিত ছোট্ট কপালের উপর নব-জাগ্রত প্রেমের প্রথম চুম্বন-রেখা আঁকিয়া দিল। নীরজা নড়িল না, চড়িল না, তাহার আকম্পিত তনুখানি এক অপরূপ সুখাবেশে মূর্চ্ছিতার মত অলোকের রক্ত-চঞ্চল বুকের উপরে লুটাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ-যে এমনভাবে কাটিল, সে-খেয়াল তাহাদের ছিল না। তাহাদের দু'জনেরই মনে হইতেছিল—এমনি বুকে বুকে রাখিয়া, গালে গাল রাখিয়া, এমন বিহ্বল চুম্বনের স্পন্দিত রেশের মধ্যে অনন্ত কালটা কি কাটানো যায় না!

সহসা এক অতর্কিত পদ-শব্দে চমকিয়া উঠিয়া তাহারা বিস্মিত-চক্ষে চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে বিজয় দাঁড়াইয়া! নীরজা চকিতের মধ্যে উঠিয়া বসিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। অলোক-নীরজাকে এভাবে কোনোদিন দেখিবে, তাহা বিজয় স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারিত না। তাই নিঃশঙ্ক-চিত্তে ঘরে ঢুকিয়াই এই অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখিয়া থতমত খাইয়া সে ফিরিয়া যাইতেছিল।

অলোক হাসিয়া বলিল—"এস বিজয়, পালাবার কোনো দরকার নেই! এই লক্ষ্মীছাড়া মানুষটার ভার নীরজার ঘাড়ে চাপিয়ে দিইছি, সেই বোঝাপড়াই আমাদের হ'চ্ছিল।"

বিজয়ের মুখে কিন্তু হাসি ফুটিল না। অলোকের এই অপ্রত্যাশিত কথায় কেমন-একটা অনির্দ্দিষ্ট হারানোর-বেদনা তাহার স্তম্ভিত প্রাণের মধ্যে খচ্ করিয়া উঠিল। সে শুষ্ক-কণ্ঠে বলিল—"সুখী হও ভাই, তোমাদের দু'জনের মধ্যে কা'র সৌভাগ্য বেশী, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!"

অলোক তেমনই হাসিয়া বলিল—"তা'র কারণ, সৌভাগ্য জিনিষটা আমরা সমানভাবে ভাগ ক'রে নিয়েছি।"

বিজয় জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া অলোকের হাসিতে যোগ দিল।

অলোক বলিল—"ব'স বিজয়, নীরজার সঙ্গে গল্প করো, আমি ওর মা'র কাছ থেকে একবার আস্‌ছি।" এই বলিয়া অলোক উঠিয়া গেল।

নির্জ্জন ঘরে নীরজা ও বিজয় একসঙ্গে রহিল, কিন্তু দু'জনেরই মুখ দিয়া সহসা কোনো কথা বাহির হইল না। বিজয়ের সম্মুখে এমনি করিয়া হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া, নীরজা লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না; আর, বিজয়ের আহত মনের ভিতরটায় যে-একটা অব্যক্ত বেদনা জমিয়া উঠিতেছিল, সে-ব্যথা সে প্রাণ-পণে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিতেছিল।

খানিকক্ষণ এম্‌নিভাবে কাটিবার পর মৌনভঙ্গ করিয়া নীরজা জিজ্ঞাসা করিল—"সুলোচনার কি হ'লো বিজয়বাবু? সেই-যে আপনি চ'লে গেলেন, তা'রপর কি হ'লো কিছুই জান্‌তে পার্‌লুম না, সারাটা-দিন আজ মনটা ছট্‌ফট্‌ ক'রছে!"

বিজয় বলিল—"আপনার নির্দ্দেশমত দু'পুর-বেলা তা'র ঘরে

গিয়ে যে-দৃশ্য চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লুম, সে-রকম ভয়ানক দৃশ্য মানুষকে যেন আর না দেখ্‌তে হয়! একটা অতি ছোট, ঘোর অন্ধকার খোলার-ঘর, চালের অর্দ্ধেক খোলা কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়েছে, তা'রই ফাঁক দিয়ে বাইরের দু'-একটা আলোর রেখা অতি ভয়ে-ভয়ে সেই ঘরের মধ্যে উঁকি মারছে! ঘরে মাটির মেজ এত ভিজে যে, খানিকক্ষণ কিছু না-পেতে ব'স্‌লে কাপড়-খানা নিংড়তে হয়। ঘরের গায়েই একটা খোলা নর্দ্দামা,—বহুদিনের সঞ্চিত হাত-দেড়েক পাঁক, ছেঁড়া ন্যাকৃড়া, শালপাতা, কুটনোর খোলা, উনুনের ছাই তা'তে প'চে আছে, সে-দুর্গন্ধ নাকে গেলে দম বন্ধ হ'য়ে আসে! এম্‌নি-একটা সুন্দর ঘরের মধ্যে অতি ছেঁড়া ময়লা এক টুকরো কাঁথার ওপর একটা এক-মাসের শিশু বেহুঁস হ'য়ে চোখ বুজিয়ে প'ড়ে আছে, আর মাঝে-মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠ্‌ছে। দেখেই বুঝ্‌লুম আর বেশী দেরী নেই, মৃত্যুর দূত ওপারের পরোয়ানা নিয়ে তা'র শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে! তা'র বেশ্যা-মা ভিজে মেজের উপর শতছিন্ন কাপড়ের আঁচলটা পেতে, সেই মরণোন্মুখ শিশুর পাশে ব'সে, গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টে তা'র পানে চেয়ে জ্বরে ধুঁকছে, আর তা'র চোখ দিয়ে টস্‌-টস্‌ ক'রে জল ঝ'রে প'ড়ছে! আমি আস্তে-

আস্তে তা'র সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ব'ললুম—মা, নীরজা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে। সে চ'মকে উঠে আমার মুখের দিকে পাগলের মতন শূন্য-দৃষ্টিতে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে রইল, কিছু ব'ল্‌লে না! আমি আর কিছু না ব'লে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে, অ্যাম্বুলেন্স্‌ গাড়ী এনে, মা ও ছেলেকে তখনই হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে, আলাদা ঘরে রেখে, যতদূর সম্ভব ডাক্তার ও নার্সের ভালো বন্দোবস্ত ক'রে দিলুম। কিন্তু—"

নীরজা উৎকণ্ঠিতভাবে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল—"কিন্তু কি?"

বিজয় বলিল—"ছেলেটার দিন ফুরিয়েই গেছ্‌লো, সন্ধ্যা-বেলা এক-মাসের মানব-লীলার পালা চুকিয়ে ফেলে, তা'র মা'র চোখের সাম্‌নে দিয়ে সে চ'লে গেল—মরণের কোলে! তা'র সৎকার ক'রে এই আস্‌ছি।"

নীরজা কাঠ্‌ হইয়া খানিকক্ষণ জানালার বাহিরে অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিল। তা'রপর ধরা-গলায় জিজ্ঞাসা করিল—"সে পোড়ারমুখীর অবস্থা কেমন?"

বিজয় বলিল—"ভালো নয়!"

নীরজা বলিল—"বাঁচ্‌বে?"

বিজয় বলিল—"দু'-চারদিন মাত্র, তা'ও সন্দেহ।"

একটা প্রকাণ্ড স্বস্তির-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাষ্প-রুদ্ধ-কণ্ঠে নীরজা বলিল—"যা'ক্—বাঁচ্লুম!"

আর কোনো কথা হইল না।

কেমন-একটা রোমাঞ্চকর স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে থম্-থম্ করিতে লাগিল,—দু'জনের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটুকুও যেন কাণ পাতিলে স্পষ্ট শোনা যায়! বাহিরে ঘরে-ঘরে তখন নূপুরের উন্মত্ত নিক্কণ, প্রাণহীন হাসির অকারণ উচ্ছ্বাস এবং তাল-মান-হীন সঙ্গীতের তাণ্ডব সুরে প্রতিরাত্রির লালসার উৎসব নীরব নিশার সব ফাঁকগুলিকে বিকট কোলাহলে পূর্ণ করিয়া জমিয়া উঠিয়াছিল।

সহসা এই জমাট স্তব্ধতাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া নীরজা যেন ঘুমের ঘোরে আপন-মনে বলিয়া উঠিল—"এম্নি ক'রে যুগে-যুগে পুরুষ বোনে পাপের বীজ, আর, তা'র ফসল কেটে আনে নারী! জানিনা এ-বিধান মানুষের, না, বিধাতার!"

ঠিক এই-সময়ে মানদার সঙ্গে তাহার কথা সারিয়া নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অলোক বলিল—"এ উৎকট বিধান বিধাতার নয় নীরা—মানুষের!"

নীরজা তাহার অশ্রু-সজল মুখখানি তুলিয়া অলোকের দিকে একবার চোখ চাহিয়াই নামাইয়া লইল। কিছু বলিল না।

আজ অলোকের দিকে চাহিতেও যেন তাহার ভয় হইতেছিল—তাহার এই মুগ্ধ স্বপনও একদিন এম্‌নি-একটা নিদারুণ আঘাতে চূর্ণ না হইয়া যায় !

অলোকের কণ্ঠ-স্বরে বিজয়েরও চমক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে অলোকের দিকে চাহিয়া বলিল—"বাড়ী যাবে অলোক ?"

বিজয়ের প্রশ্নে অলোক একটু বিশেষ-রকম আশ্চর্য্য হইয়া গেল—রাত্রি দশটায় যা'র সন্ধ্যা হয়, সে আজ হঠাৎ কি-কারণে ভালো-মানুষটির মত এরই মধ্যে বাড়ী ফির্‌তে চায় !

অলোক হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, যাবো, চলো।"

দু'জনে উঠিয়া দাঁড়াইল।

* * * * * *

পথে চলিতে-চলিতে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"অলোক, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কি তুমি নীরজাকে এম্‌নি ক'রে ভালোবাস্‌তে পার্‌বে ব'লে তোমার মনে হয় ?"

বিজয়ের এ-প্রশ্ন এতই কঠিন, এতই অতর্কিত যে, সহসা কোনো উত্তর অলোকের মুখে যোগাইল না। সে কেমন-যেন-একটু থমকিয়া গিয়া বলিল—"তোমার কি মনে হয় ?"

বিজয় বলিল—"পার্‌তেও পারো, না-পার্‌তেও পারো! পার্‌বেই ব'লে নিশ্চয় হ'তে পার্‌ছি না!"

অলোক বলিল—"কেন?"

বিজয় বলিল—"ভালোই শুধু বেসেছ, কিন্তু ভালোবাসার পরীক্ষা তো কোনোদিন দাওনি! সে-পরীক্ষায় যে পাশ হবেই—সে-কথা আগে থেকে জোর ক'রে ব'লতে পারো না।"

৯

নীরজার বাড়ী হইতে ফিরিয়া রাত্রির আহারাদির পর অলোক তাহার বাহিরের ঘরে আসিয়া, একখানা কৌচের উপর হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। আজ সন্ধ্যার ঘটনাগুলা তাহার মুগ্ধ অন্তরের সবখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল। নীরজার সেই শঙ্কিত-কম্পিত চাহনি, লজ্জারক্ত মুখখানি, সেই আবেশ-বিহ্বল ক্ষীণ তনু—সবই ঠিক তেমনই করিয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে জ্বল্‌-জ্বল্‌ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—তাহার এতদিন-কার নির্ববন্ধন জীবনটাকে আজ-যে সে একটা সুমধুর মায়ার বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলিল, কে জানে তাহার ফল কি হইবে! এতদিন

তাহার একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অন্ধ সংস্কারের কোনো ধার না না ধারিয়া, অনাবিল সত্যের মুক্ত-উদার আলোকে সে তাহার জীবনটাকে কাটাইবে। কিন্তু আজ যখন তাহার বাস্তব জীবনে যথার্থই সত্য ও সংস্কারের শক্তি প্রত্যক্ষ যাচাই করিবার দিন আসিয়া পড়িল, তখন একটা ক্ষীণ সন্দেহের ছায়া তাহার মনের কোণে জাগিয়া উঠিল—সংস্কারকে দু'-পায়ে মাড়াইয়া কেবলমাত্র নিছক সত্যের উপরে মানুষ সারাজীবনটা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে কি! নীরজার অতীত-জীবনের সমস্ত ধূলা-কাদা ধুইয়া-মুছিয়া সে তাহাকে নারীত্বের পূর্ণ গৌরবে তাহার জীবন-বেদীর 'পরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, কিন্তু সমাজ তো সে-অনুমতি তাহাকে দেয় নাই—কোনোদিন দিবেও না! নীরজাকে বিবাহ না করিয়া যদি সে তাহার সহিত বাস করে, তবে তাহাদের মধ্যে যতই অটুট বাঁধন থাকুক্ না কেন, সমাজ তো কোনোদিন বলিতে ছাড়িবে না যে, নীরজা তাহার রক্ষিতা! স্ত্রীর যত সম্মান, যত মর্য্যাদাই সে নীরজাকে দিক্ না কেন, সংস্কারের-দাস মানুষের অসম্মান ও অমর্য্যাদা হইতে কি করিয়া সে সারা-জীবন নীরজাকে বাঁচাইবে!......

হো'ক তাহা, তবু সে বিচলিত হইবে না! মানুষের ভয়ে

সত্যকে ছাড়িয়া প্রাণহীন সংস্কারের পায়ে সে কিছুতেই মাথা নোয়াইবে না! যত অপমান, যত অসম্মানই তাহার জীবনটাকে বিষাক্ত করিয়া তুলুক্, এ-গর্ব্ব সে কোনোদিনই ছাড়িবে না যে, সত্যের পথেই সে আজীবন চলিয়াছে—কপট সাধুতার অভিনয় করিয়া কোনোদিন সমাজের কাছে সে বাহবা চাহে নাই। যে-আশা সে এই খানিক পূর্ব্বে নীরজাকে দিয়াছে, আজ মানুষের যুক্তিহীন সংস্কারের ভয়ে সে-আশা তাহার কাছ হইতে সে কাড়িয়া লইবে!—ছিঃ, তা' হইতেই পারে না! নীরজা তাহার, সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দ্দিনে তাহার!—তাহাকে বুকে করিয়া সমস্ত ঝড়-ঝাপ্‌টা সে মাথা পাতিয়া লইবে!

এম্‌নি করিয়া মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করিয়া অলোক নিশ্চিন্ত হইল, কোনো দ্বিধা, কোনো সংশয়কে সে আর মনের কোণে ঠাঁই দিল না।

আজ তাহার কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া, সে উঠিয়া পাশের লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকিল। এই লাইব্রেরী তাহার পিতার অতি আদরের জিনিস ছিল, নানা দেশের নানা প্রকার বই সযত্নে সংগ্রহ করিয়া তিনি এই লাইব্রেরী পূর্ণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অলোক

এ-ঘরে বড়-একটা প্রবেশ করে নাই। আজ হঠাৎ কি মনে করিয়া এক বিখ্যাত জার্ম্মান্ লেখকের একখানা উপন্যাসের সন্ধান করিতে সে এই ঘরে ঢুকিল। এ-বই ও-বই নাড়িয়া সে সেই উপন্যাসখানা খুঁজিতে লাগিল। উপরের তাকে খুঁজিতে খুঁজিতে একখানা সুন্দর চামড়া-বাঁধানো পাত্‌লা খাতা নীচে পড়িয়া গেল। সেখানা উঠাইয়া অলোক দেখিল একখানা ডায়েরী—তাহার পিতার নিজের হাতে লেখা! এ-খাতা কোনো-দিন অলোকের চোখে পড়ে নাই। খাতাখানা হাতে করিয়া সে ফিরিয়া আসিল। খুলিয়া দেখিল ডায়েরীর অধিকাংশ পাতা ছিঁড়িয়া নষ্ট করা হইয়াছে, কেবলমাত্র কয়খানি পাতায় সুদূর অতীতের কোন্ বিস্মৃত কাহিনী তাহার পিতা জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া নির্জ্জনে রাখিয়া গিয়াছেন—যেন তাহারই জন্য! কৌচে শুইয়া পড়িয়া খাতাখানা খুলিয়া অধীর আগ্রহে অলোক পড়িতে লাগিল :—

* * * * *

১৩ই পৌষ—প্রমোদ আমার কতদিনের পুরোণো বন্ধু! শৈশবের রুদ্ধ স্মৃতির দুয়ার খুল্‌লেই আমার উৎসুক চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়ায় শুধু সে! কী অকুণ্ঠিত মেশামিশি ছিল তা'র

সঙ্গে! কোনো দেওয়াল, কোনো আড়াল আমাদের দু'জনের মধ্যে ছিল না—অন্তরে নয়, বাইরেও নয়! সেই প্রমোদ যখন অকস্মাৎ একদিন তা'র তরুণী বৌটির সিঁথের লাল রেখাটুকু মুছে দিয়ে, পাড়ি দিলে সেই চির-অজানা লোকে, সেদিন মনে-মনে কী বিদ্রোহই না ক'রেছিলুম নিষ্ঠুর বিধাতার ওপর!—কিন্তু হায় অসহায় মানুষ! কোথায় গোপনে তোর জন্যে যে কি আয়োজন চ'লছে, তা'র ঠিকানা কি কিছু তুই পাস্! এ অক্ষম অভিমান তোর কেন!......

২১শে মাঘ—বিলেতে গেছ্লুম প'ড়তে, কিন্তু সে জীবন্ত দেশের মুক্ত-অবাধ প্রাণের উদ্দাম ফেনিল উচ্ছ্বাস প্রতি দিনের প্রতি নিমেষে আমার নিরালা চিত্ত-সৈকতে এসে শতধারে ছড়িয়ে প'ড়তো। সন্ধ্যা-বেলা পিকাডিলিতে বেড়াতুম, আর উন্মনা হ'য়ে ভাব্তুম, কী স্বচ্ছ-বিপুল আনন্দ ওই হোথায়—যেথায় হাতে হাত জ'ড়িয়ে, গায়ে গা ঠেকিয়ে, নিশ্চিন্তে নিঃশঙ্কে তরুণ তরুণী ঘুরে বেড়াচ্ছে! বল্-পার্টিতে নিমন্ত্রণ যেতুম, আর ক্ষুধিত হৃদয় মেলে চেয়ে-চেয়ে মনে হ'তো—ওই তো প্রাণ ওখানে, যেখানে ওয়াল্‌জের তালে-তালে বুকে বুক ছুঁইয়ে, স্পন্দিত রক্তের রুদ্র ছন্দে, আলিঙ্গন-বদ্ধ পুরুষ ও নারী শ্রাবণ-মেঘের বজ্র-তালে ময়ূর-

ময়ূরীর মতন বিহ্বল উল্লাসে নাচ্‌ছে! প্যারির বুল্‌ভার্‌! সাঁ-দে-লিজে!!—ভুলে যেতুম যে আমি প্রবাসী, কত দূর দেশ ছেড়ে এসেছি এই বিদেশে, সামান্ত ক'টা বছরের জন্যে। তখন মনে হ'তো—আমার কোনো দেশ নেই, আত্মীয়-স্বজন নেই, অন্য কিছুই নেই!—এই জীবন-চঞ্চল দেশই আমার দেশ, এই প্রাণের-উচ্ছ্বাস-ভরা মানুষগুনোই আমার একান্ত আত্মীয়, এই উন্মুক্ত উদ্দাম আবেগই আমার অন্তরের প্রতিধ্বনি!......

১৭ই ফাল্গুন—বিলেত থেকে ফিরে দেখ্‌তে গেলুম প্রমোদের বিধবা বৌ—আভাকে! একটি নিমেষ আমার মুখের দিকে চেয়ে সে ক্লান্ত চোখ-দু'টি নত ক'রলে,—একটি ক্ষুদ্র নিমেষমাত্র,—কিন্তু কত যুগ-যুগান্তের চাওয়া যে সে সেই নিমেষের চাহনিটুকুর মধ্যে দিয়ে চাইলে, সেই কিছু না-বলার মধ্যে দিয়ে কত-কথা যে সে আমার কাণে-কাণে ব'লে গেল,—তা'র হিসেব কোনোদিন ক'রতে পার্‌বো না!

৩রা শ্রাবণ—রাত একটা বেজে গেছে, কিছুতেই আজ ঘুম আস্‌ছে না। বাইরে জমাট কালো অন্ধকার, আর তা'রই মাঝে ঝুপ্‌-ঝুপ্‌ ক'রে অশ্রান্ত বৃষ্টি প'ড়ছে!—ঠিক আমার আজ্‌কের এই সুপ্তিহারা অন্তরের প্রতিচ্ছবি! ওম্‌নি কালো-আঁধার-ভরা

ছিন্ন-তার

আমার মনের মধ্যে আজ কত-কথাই ওম্‌নি ঝুপ্‌-ঝুপ্‌ ক'রে ঝ'রে প'ড়ছে—কোন্ অজানা কল্পলোক থেকে! কত-দিনের-কত-বাষ্প-জমা আমার মানসাকাশের এই-যে কাজল মেঘ, এর এই উন্মাদ বর্ষণ যে আজ কিছুতেই নিঃশেষ হ'তে চাইছে না! ......আভা বিধবা!—কেন-না যে-মানুষটিকে স্বামী নাম দিয়ে সমাজ তা'র জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে জ'ড়িয়ে দিয়েছিল, সে-মানুষটি আজ আর এ-পৃথিবীতে নেই! কিন্তু যে অদৃশ্য মানুষটি লোক-চক্ষুর অন্তরালে ব'সে আপন-মনে চিরদিন ধ'রে মানুষের হাসি-কান্নার জাল বুন্‌ছে, সেই অলক্ষ্য শিল্পী যেদিন গোপনে ওর ওই বুকটুকুর মধ্যে মৃত্যুহারা প্রাণের আল্‌পনা এঁকে মানব-হৃদয়ের মেঘ-ও-রৌদ্র-ভরা এই জগতে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিল, সেদিন কি সে ওকে কারুর স্ত্রী ব'লে তৈরী ক'রেছিল, না, এই অনন্ত প্রাণের মাঝে তা'কে শুধু একটি খণ্ড-প্রাণ ক'রে তৈরী ক'রেছিল? সেদিন কি সে কারুর স্ত্রী ছিল, না, লক্ষ-কোটি নারীর মাঝে সে ছিল—কেবলমাত্র একটি নারী? সেই শিল্পী সেদিন শুধু এইটুকু চেয়েছিল যে, কোনো রসিক পুরুষ এই স্বর্ণ-বীণাটিকে কোলে তুলে নিয়ে অন্তরের পরিপূর্ণ আনন্দে বাজাবে—বিশ্ব-সুরের ঐক্যতানে!—আর কিছু সে চায়নি। কিন্তু

হৃদয়হীন মানুষ লক্ষ্য বিধি-নিষেধের খড়্গ উদ্যত ক'রে এই বীণার সূক্ষ্ম তারগুলোকে ছিঁড়ে দিতে চায়! ওরে মূর্খ মানুষ, চিরন্তনী প্রকৃতির গলা টিপে মেরে ফেল্‌বি,—এত বড় শক্তিমান তুই! এই দুঃসাহসই তো ডেকে এনেছে যত তোর দুঃখ, যত তোর দুর্দ্দশা, যত তোর পরাজয়কে!......

৯ই শ্রাবণ—অলোকের মা'র সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়েছিল, বিলেত যাবার অনেক আগে—যখন পশ্চিমের খোলা হাওয়া আমায় এমন ক'রে মাতাল ক'রে দেয়নি, যখন আমার ভেতরকার মানুষটা তখনও দরজায় খিল্ দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো! কতদিন মনে হ'য়েছে যে, নর্‌ওয়ের মতন এই ভারতবর্ষে যদি অমন সহজ-সরল ডাইভোর্সের প্রথা থাক্‌তো, তা'-হ'লে কোনো দ্বিধা না ক'রে সে-বেচারীকে মুক্তি দিতুম, নিজেও মুক্তি পেতুম! তা'র মধ্যে যে কিছু নেই, তা' নয়। কত দেশ ঘুরেছি, কত নারীর সঙ্গে বিভোর হ'য়ে মিশেছি, কিন্তু অমন স্নিগ্ধ-প্রকৃতি, স্নেহশীলা, বুদ্ধিমতী নারী আমি আমার জীবনে দু'টো দেখিনি। কী শান্ত, কী ধীর, কী উদার! সবই তা'র আছে, কিন্তু নেই ঠিক সেই জিনিষটি, যে-জিনিষটি আভার ছোট্ট বুকখানির মধ্যে উপ্‌চে প'ড়ছে—সেই পরিপূর্ণ প্রাণের স্পন্দন! তা'কে মনের মধ্যে

কত শ্রদ্ধা করি, কিন্তু একটা দিনের জন্যও আভার মতন তা'র দিকে আমার সমস্ত হৃদয়-মন অমন ক'রে উন্মুখ হ'য়ে থাকেনি! কতদিন তা'কে ভালোবাস্‌বার চেষ্টা ক'রেছি, কতদিন ভেবেছি বেচারীর এই ব্যর্থ-শুখ্‌নো দাম্পত্য-জীবনটাকে একটুখানি স্নেহ-প্রেম দিয়ে সবুজ ক'রে তুলি, কিন্তু আমার মধ্যে আর-একটা যে প্রাণের-কাঙ্গাল মানুষ আছে, সে আমায় হিড়্‌-হিড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে ব'লতো—দূর মূর্খ! এই প্রেমের অভিনয় ক'রে কি হবে!—এতে তোর লাভ কি, অলোকের মা'রই বা কি লাভ! মিথ্যা দিয়ে কি কখনও সত্যকে পাওয়া যায় রে! তুই যা' চাস্‌, তা' অলোকের মা'র মধ্যে নেই, সে আছে ওই ওখানে—তোর বাল্য-বন্ধুর ওই বিধবা-স্ত্রীর মধ্যে!......

১৩ই শ্রাবণ—আজকাল্‌ কেবলই মনে হয়—ওই আভা যদি এই ভারতবর্ষে না জ'ন্মে পৃথিবীর অন্য-যে-কোনো দেশে জন্মাতো, তা'-হ'লে তো ওর ওই ভাঙ্গা খেলা-ঘরখানাকে ও আবার ইচ্ছামত সাজিয়ে তুল্‌তে পার্‌তো, ওর ওই স্তব্ধ-নীরব হৃদয়-দেউল কত আনন্দে, কত গানে আবার মুখর হ'য়ে উঠ্‌তো! কিন্তু ভাগ্য-দোষে আমাদের সমাজে জ'ন্মেছে ব'লেই, তা'র নারীত্বের সমস্ত দাবী-অধিকার থেকে বঞ্চিতা হ'য়ে, তা'র অন্তরের সমস্ত

ক্ষুধা-তৃষ্ণার গলা টিপে মেরে ফেলে, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের অবজ্ঞার পূর্ণপাত্র নতশিরে বহন ক'রে, বুকের মধ্যে অতৃপ্তির আগুণ জ্বেলে, তা'কে সহজ-মানুষের মতন বেঁচে থাকতে হবে! তা'কে ঘিরে তা'র চারদিকে ঘরে-ঘরে জ্ব'লবে ভোগের বাতি, প্রাণে-প্রাণে বাজ্‌বে উৎসবের বাঁশী, ঠোঁটে-ঠোঁটে ছুট্‌বে হাসির ফোয়ারা, চোখে-চোখে চ'লবে মন দেওয়া-নেওয়া,—আর চতুর্দ্দিকের সেই ভোগের হাটে দাঁড়িয়ে তা'কে জোর ক'রে অভ্যাস ক'রতে হবে বৈরাগ্য, পালন ক'রতে হবে ব্রহ্মচর্য্য !! এই অস্বাভাবিক ভণ্ডামী যদি সে ক'রতে পারে, তবেই সে সতী, নইলে—!

২১শে ভাদ্র—অনেক-দিন পরে আবার আজ বর্ষণ-ক্ষান্ত আকাশে শরতের নীল রং ফুটে উঠেছে! কী স্বচ্ছ সুন্দর আকাশ! মানুষের জীবনটাও কেন ওম্‌নি মুক্ত, ওম্‌নি উদার হ'য়ে এই শ্যামল ধরণীর বুকের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে না! কেন লক্ষ বিধি-বিধানের নাগপাশ মানুষকে এমন নির্দ্দয়ভাবে আষ্টে-পৃষ্টে জ'ড়িয়ে র'য়েছে! কাল সন্ধ্যা-বেলা আভার চিঠি পেলুম। সে লিখেছে—"ঠাকুরপো, তোমার এ চিঠির কী-যে উত্তর দোবো, আজ সারাদিন ধ'রে ভেবেও ঠিক ক'রতে পারিনি! তোমায় চিঠি লিখ্‌তে ব'সলে এই পোড়া বুকখানার মধ্যে কত-কথা যে

ঠেলাঠেলি ক'রে ওঠে, তা'র কোনো কূল-কিনারা পাই না! আচ্ছা ঠাকুরপো, যে-সব জ্ঞানী পণ্ডিতরা আমাদের সমাজের আইন-কানুনগুলো তৈরী ক'রেছিলেন তাঁ'দের কি হৃদয় ব'লে কোনো জিনিস ছিল না, তাঁ'দের শরীরটা কি রক্ত-মাংসে গড়া ছিল না, তাঁ'দের আকাশে কি চিরদিন রোদ্‌ই উঠ্‌তো, মেঘ ভেসে যেতো না?—যা'ক্, আমার এ-সব ব্যথা আমারই থাক্!

"কী ভাবে যে আমার জীবন কাট্‌ছে, পুরুষ তুমি তা' অনুভব ক'রতে পারবে না! আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার প্রতি কোনো কু-চিন্তাকে কোনোদিন ভুলেও আমি মনের কোণে স্থান দিইনি! আমার অপরাধ এই যে, তোমায় আমার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে, তোমার সঙ্গে কথা কইতে ভালো লাগে, তোমায় আমি শ্রদ্ধা-করি। বিধবার এত-বড় ভয়ানক অপরাধ কি ক্ষমা করা যায়!—তা'-হ'লে যে সৃষ্টি উল্‌টে যাবে, সমাজ আর বাঁচ্‌বে না! কাজেই আমার নামে কি-সব যে র'টেছে, সে-কথা শুন্‌লে তুমি কাণে আঙ্গুল দেবে। প্রতিদিন পাড়ার মেয়েরা বেড়াতে এসে আমার দিকে আড়্‌চোখে চেয়ে মুচ্‌কে হাসে, প্রৌঢ়ারা দরদ্ দেখিয়ে ঠেস্ দিয়ে বলে থান্-কাপড়ে, খালি-হাতে আমায় মানায় না। বাইরের ঘরে পুরুষের দলও এত চুপি-চুপি আমার কল্যাণ

কামনা করেন যে, সদর-মহল পার হ'য়ে এসে অন্দরের এই শেষ প্রান্তে তাঁ'দের মৃদু কণ্ঠ-স্বর আমার কাণে এসে সুধা বর্ষণ করে! কী সুখের আমার জীবনটা ব'ল তো ভাই! এক-একবার মনে হয়—! থাক্, সে আর ব'লবো না। বেশ বুঝ্‌তে পারছি হৃদয়টা দিন-দিন কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ছে, যে-বিদ্রোহের আগুণের এক-একটা স্ফুলিঙ্গ প্রতিদিন এম্‌নি ক'রে এই উৎপীড়িত মনের মধ্যে জমা হ'য়ে উঠ্‌ছে, একদিন যখন সে-আগুণ দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌বে, সে-দিন কি হবে তা'ই কেবল ভাবি!......"

৭ই আশ্বিন—কি করি! প্রতিদিন আভার ওপর এক-একটা নতুন অপমান, নতুন অত্যাচারের খবর আমার কাণে এসে পৌঁচচ্ছে! প্রতিদিন এম্‌নি ক'রে এক-একটা অকারণ অবজ্ঞা ওই দুর্ভাগিনী নারীর জীবনটাকে অসহ্য ক'রে তুল্‌ছে! শরতের সুদূর-ব্যাপ্ত নীল আকাশের পানে অনিমেষ-নয়নে চেয়ে থাকি, আর মনে হয়—একটা নির্ম্মম অপমানের উষ্ণ নিঃশ্বাসে অহরহ ঝ'লসে ওঠ্‌বার জন্যেই কি ওই গন্ধ-বর্ণভরা ফুলটি ফুটে উঠেছিল! ......না, আমি তা' কিছুতেই হ'তে দোবো না! আভা লিখেছে—"আমি আর কিছুই ব'লবো না! আমার এই দগ্ধ জীবনের একমাত্র বন্ধু তুমি, তাঁ'র পরেই স্নেহ পেয়েছি শুধু

তোমার কাছ থেকে,—তাঁ'র শ্রীচরণোদ্দেশে প্রণাম ক'রে তোমারই হাতে আমার ভালো-মন্দ সঁ'পে দিলুম! আজ ভগবানের কাছে শুধু এই প্রার্থনা করি যে, যদি কোনোদিন কোনো অপরাধ আমি ক'রে থাকি, তিনি যেন আমায় তা'র পূর্ণ শাস্তি দেন, আমার ওপর করুণা ক'রে যেন আমার পাওনা শাস্তি থেকে তিনি আমায় বঞ্চিত না করেন!"......তা'ই হো'ক্, আমিই তা'র ভালো-মন্দ তুলে নোবো; চুলোয় যা'ক্ আমার নিষ্ঠুর সমাজ, আমার অন্ধ সংস্কার,—আমার মিথ্যা ধর্ম্ম!

১৯শে আশ্বিন—পূজার আর মাত্র পাঁচটি দিন বাকী আছে! আভার জন্যে একখানা নিরিবিলি বাড়ী ঠিক ক'রে সাজিয়ে রেখেছি! ষষ্ঠীর দিন নিশীথ-রাতে আমার জীবন্ত প্রতিমার বোধন হবে, তা'রপর—

* * * * *

২৩শে আশ্বিন—তিন-তিনটে বছর কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যে কেটে গেল, কিছুই টের পেলুম না! আবার সেই আশ্বিন ফিরে এসেছে, মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশ আবার তেমনি ক'রে নীল রঙে সেজেছে, রৌদ্রোজ্জ্বল বাতাস তেমনি ক'রে হেসে উঠ্‌ছে! এই তিনটে বছর আভা যেন একটা অশ্রান্ত ঝঙ্কারের মতন

আমার জীবনটাকে ছন্দে-সুরে পূর্ণ ক'রে রেখেছিল। আজ মনে হয়—সমাজকে ছেড়ে চ'লে এসে আভা কিছুই হারায়নি, হারিয়েছে ওই মূর্খ সমাজটাই, যে এই মাণিককে চেনেনি। আভার মেয়েটি, দেখ্‌তে-দেখ্‌তে ছ'-মাসের হ'লো। ও যেন ওর মা'র জীবন্ত প্রতিচ্ছবি! বোধহয় বড় হ'লে লোকে ওকে জারজ ব'লে ঘৃণা ক'রবে। ততদিন আমি বাঁচ্‌বো কি না জানি না। কিন্তু বাঁচি, বা না বাঁচি, আজ আমি এই বুক ফুলিয়ে নিঃসন্দেহে লিখে যাচ্ছি যে, আভার মেয়ে খারাপ হ'তেই পারে না, মানুষ তা'কে যা'ই ভাবুক, সমাজ তা'কে যা'ই ব'লুক, প্রেমহীন বিবাহের প্রাণহীন মিলনে তা'র জন্ম নয়, সে জ'ন্মেছে অচঞ্চল প্রেমের মধ্যে, অনাবিল পুণ্যের মধ্যে, অকপট সত্যের মধ্যে!—সতীর রক্তে তা'র দেহ গড়া, সতীর চির-জাগ্রত আশীর্ব্বাদ মৃত্যুর পরপার থেকে চিরদিন তা'কে ঘিরে থাক্‌বে!

১১ই ফাল্গুন—সেই পাঁচটি বছর আগে একদিন এক শরৎ-সন্ধ্যায় যে দেবী-প্রতিমার বোধন ক'রেছিলুম, আজ এই বসন্ত-প্রভাতে আমার সেই প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়ে এলুম!! ভগবান, শুনেছি তোমার জগতে কিছুই নষ্ট হয় না, তুমি যে-জীবন সৃষ্টি ক'র তা'র মৃত্যু নেই,—শুনেছি একদিকে যা' ভাঙ্গে,

আর-একদিকে তা' গড়ে, একদিকে যা' শূন্য, অন্যদিকে তা' পূর্ণ! কিন্তু অজ্ঞান আমি, অবোধ আমি, ওগো ব'লে দাওগো সে আমার কোথায় চ'লে গেল! ব'লে দাও—আমার পথ-দেখানো দিনের-আলো কোন্ অস্তগিরির কোলে তুমি ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দিলে, কবে আবার রাত্রিশেষে আমার এই ঘুমিয়ে-পড়া আলোর তুমি ঘুম ভাঙ্গিয়ে জাগিয়ে দেবে! কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্তও যে সে এই পৃথিবীতে আমার চোখের সাম্‌নে ছিল! ওই-যে আল্‌নায় তা'র নিজের-হাতে-কোঁচানো শাড়ীখানা ঝুল্‌ছে, ওই-যে বড় আয়নাটার সাম্‌নে তা'র চুল-বাঁধা ফিতে-কাঁটা প'ড়ে র'য়েছে, ওই-যে টেবিলের ওপর তা'র আধ-পড়া বইখানার পাতার কোণ্‌টা মোড়া র'য়েছে, ওই-যে ছাদের কোণে তা'র আচারের-শিশিটা রোদে শুখোচ্ছে!—সবই ঠিক তেম্‌নি র'য়েছে, কিন্তু যা'কে ঘিরে এই-সব, সে কোথায়!......কাল শেষরাত্রে তা'র চিতার জ্বলন্ত অগ্নি-শিখা যখন লক্-লক্ ক'রে ঊর্দ্ধ-পানে উঠ্‌ছিলো, তখন মনে হ'চ্ছিল যে, তা'রই কপালের সিঁদূর-রাগে সেই অগ্নি-শিখা লাল হ'য়ে উঠেছে, যেন সেই সতীর বুকের রুদ্র-তেজ আগুন হ'য়ে জ্ব'লে উঠে উড়ে চ'লে যাচ্ছে—স্বর্গে!......প্রমোদ, নাও ভাই তোমার জিনিষ ফিরিয়ে নাও! যতদিন তোমার মণিকে আমার

কাছে রেখে দিয়েছিলে, ততদিন আমি তা'কে রেখেছিলুম অতি যত্নে, অতি আদরে—বুকে ক'রে! আজ তোমার নিধি তোমায় ফিরিয়ে দিলুম! আর আমার কোনো দায়িত্ব নেই,—আজ আমি মুক্ত!......ওই, তা'র জীবন্ত স্মৃতি মেজে কার্পেটের ওপর নিশ্চিন্তে-নির্ভয়ে ঘুমোচ্ছে, জেগে উঠে যখন আমার হাঁটু-দু'টো দু'-হাতে জ'ড়িয়ে, আমার মুখের দিকে ছল্-ছল্ আঁখি-দু'টি তুলে জিজ্ঞাসা ক'রবে—তা'র মা কোথায়, তখন তা'কে কি ব'লবো!......

১৯শে ফাল্গুন—এই মাতৃহারা মেয়েটার ভার কা'র হাতে দিই! ইচ্ছা করে অলোকের মা'র কোলে একে তুলে দিই! কিন্তু যদি একে অকুণ্ঠিত-চিত্তে গ্রহণ ক'রতে সে না পারে, তা'-হ'লে—? না, দরকার নেই বেচারীর জীবনটাকে আর বিড়ম্বিত ক'রে! তা'র চেয়ে ওই মানদা ওকে চাইছে, ব'ল্‌ছে এই বাড়ীতে থেকে সে একে আমার চোখের সাম্‌নে মানুষ ক'রবে। গঙ্গার ঘাটে আলাপের পর মানদা আভার কাছে প্রায়ই বেড়াতে আস্‌তো। কিন্তু সে-যে বেশ্যা, তাই তা'র হাতে আভার মেয়েকে তুলে দিতে মন স'রছে না।......না, ওই মানদার কাছেই নীরজাকে দোবো! যদি এর অদৃষ্টে দুঃখ লেখা থাকে, তবে

অক্ষম মানুষ আমি, আমার সাধ্য কি তা'র তিলমাত্র খণ্ডাই! আর যদি কোনোদিন এক শুভক্ষণে কোনো মুক্তির দূত এসে করুণা ক'রে এই মাতৃহারা অভাগিনীকে বুকে তুলে নেয়, তবে লক্ষ-কোটি মানদা একে আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বে না!—ভাসিয়ে দিলুম নীরজাকে অজানা ভবিষ্যতের আঁধার-স্রোতে, কি আছে সেথায় জানি না! হে নিয়তি, সর্ব্ব-শক্তিময়ি, মানবের অলক্ষ্য ভাগ্য-নিয়ন্ত্রি, তুমি তুলে নাও, আমার আভার বুকের ধনকে তোমার চরণে স'পে দিলুম, প্রেমের-সাগর-ছ্যাঁচা এই সুধা-পাত্র তোমারই মন্দির দ্বারে রেখে দিলুম! তুমি একে দয়া কোরো! ওগো, এর মা নেই!!

* * * * *

ডায়েরীখানা পড়া শেষ হইলে বন্ধ করিয়া অলোক আস্তে-আস্তে পাশে রাখিয়া দিল। এ যেন একটা দুর্দ্দান্ত কাল-বৈশাখীর ঝড়, আচম্‌কা আসিয়া তাহার যৌবন-নিকুঞ্জের সব ফুলের পাপ্‌ড়ি-গুলি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। অদৃষ্টের এ কী কদর্য্য পরিহাস! নীরজা—যাহাকে নিজের জীবনের সঙ্গে গাঁথিয়া সে এই মাত্র কত রঙ্গীন স্বপ্ন দেখিতেছিল, যাহার বিহ্বল চুম্বনের রেশটুকু এখনও তাহার ঠোঁটের কোণে জড়াইয়া আছে,—

সে তাহার বোন্!!—হাতের উপর মাথাটা রাখিয়া অলোক ভূতে-পাওয়ার মত শূন্য-দৃষ্টিতে কৌচের উপর চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। রাত্রি বারোটা, একটা, দুইটা, তিনটা একে-একে বাজিয়া যাইতে লাগিল, তাহার চোখের পাতা-দু'টা একটুও বুজিয়া আসিল না!

১০

সুলোচনার মৃত-দেহ দাহ করিয়া শুষ্কমুখ ও রুক্ষকেশে শ্মশান হইতে সকাল-বেলায় বাড়ী ফিরিয়া বিজয় একখানা ইজি-চেয়ারের উপর চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। শরীর তাহার ক্লান্ত, হৃদয় তাহার নিঃশব্দ বেদনার ভারে বিপর্য্যস্ত! সুলোচনাকে হাঁসপাতালে আনিয়া এই দুইটা দিন অশ্রান্ত সেবা-যত্নের দ্বারা সে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কত-না চেষ্টাই করিয়াছে! কিন্তু পারের খেয়া যাহার ঘাটে আসিয়া ভিড়িয়াছে, তাহাকে ফিরাইবার সাধ্য মানুষের কোথায়! তাই দুইটা দিন রোগের জ্বালায় এবং তাহার লক্ষগুণ বেশী মনের জ্বালায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক্ হইয়া সুলোচনা চলিয়া গেল—তাহার বিধাতার কাছে, তাহার মর-জীবনের হিসাব-নিকাশ করিতে। যৌবনের ভোর হইতে সুরু করিয়া

আজ পর্য্যন্ত দেহ-বেচা-কেনার হাটে কত বৃন্ত-চ্যুতা নারীর জড়-দেহটাকে লইয়া বিজয় কত ভাবে কত খেলা করিয়াছে, কত স্থূল অনাবৃত লালসার পাঁকে দলিয়া মথিয়া তাহাদের হৃদয়টাকে সে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে! কোনোদিন তাহার মনে হয় নাই ওই পূতিগন্ধময় জীবনগুলার বাহিরের ওই আনন্দ-মুখর হাসির নিভৃত অন্তরালে কত দিনের কত গোপন-ব্যথা-নিংড়ানো অশ্রু জমাট্ হইয়া থাকিতে পারে। তাই তাহার মনে হইতে লাগিল যেন খেয়া-ঘাটের পথে হু'টা দিনের জন্য একটুখানি থামিয়া, তাহার রুদ্ধ হুয়ারটাকে একটুখানি ফাঁক করিয়া, সুলোচনা সেই অজানা পুরীর সন্ধানই তাহাকে দিয়া গেল! বিজয় ভাবিতেছিল—কোথায় গেল ওই মেয়েটা, কি-কারণে সে অত দুঃখ পাইল, জীবন-উষায় পাখীর গানে পাপ্‌ড়ি মেলিতে-না-মেলিতে কেন ওই ফুলটি অমন করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পথের ধূলার উপর ছড়াইয়া পড়িল?......

বিজয়ের এই চিন্তা-ধারাকে প্রতিহত করিয়া অলোক ঘরে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্তের জন্য দু'জনেই পরস্পরের মুখের পানে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, দু'জনেরই মুখের উপর ঝড়ের রেখা আঁকা, কিন্তু কী-যে সে ঝড়, আর কেন-যে তাহা এমন করিয়া

সব ওলট্-পালট্ করিয়া বহিয়া গিয়াছে, সে-কথা কেহই কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল না।

জোর করিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া অলোক বলিল—"ভাই বিজয়, আমি এখন কিছু-দিনের মতন ক'লকাতার বাইরে যাচ্ছি।"

বিজয় বলিল—"কেন, হঠাৎ এই দু'দিনের মধ্যে ক'লকাতার বাইরে তোমার কি দরকার প'ড়লো ?"

অলোক বলিল—"না, দরকার এমন-কিছু নয়। দিন-কতক কোনো দূর নির্জ্জন জায়গায় থেকে পড়াশুনো ক'রবো।"

বিজয় তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে অলোকের মুখের দিকে চাহিল। এত পড়ার চাড় তো এ-পর্য্যন্ত অলোকের কোনোদিন দেখা যায় নাই! আর, যদি মন দিয়া পড়াশুনা করিবার ইচ্ছা তাহার সত্যই জাগিয়া থাকে, তবে তাহার নিজের বাড়ীতে তো তাহাকে বিরক্ত করিবার কেহই নাই, কলিকাতা ছাড়িয়া কোনো দূর নির্জ্জন দেশে পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি! এ নিশ্চয়ই মিথ্যা ওজর!

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"নীরজার খবর কি? এ-দু'দিন আমি একটা কাজে বড্ড ব্যস্ত ছিলুম, তা'কে ছবি-আঁকা শেখাতে যেতে পারিনি।"

নীরজার নামে অলোক কেমন-যেন-একটু চমকিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া নির্ব্বিকার-কণ্ঠে বলিল—"তা'র খবর ব'লতে পারি না, আমিও এই-দু'দিন তা'র ওখানে আর যাইনি।"

অলোকের চাঞ্চল্য ক্ষণিক হইলেও তাহা বিজয়ের দৃষ্টি এড়াইল না। সে বলিল—"এইবার বুঝেছি, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে একটা কোনও গোলমাল হ'য়েছে! মনে আছে অলোক, সেই-দিনই নীরজার বাড়ী থেকে ফের্‌বার সময় পথে তোমায় ব'লেছিলুম যে, তোমার ভালোবাসার এখনও পরীক্ষা হয়নি?"

জোর-করা হাসি অলোকের মুখ হইতে দপ্‌ করিয়া নিভিয়া গেল। সে বলিল—"ভালোবাসার পরীক্ষা কা'কে বলে জান বিজয়?"

বিজয় বলিল—"জানি, যে-ভালোবাসা জীবনের সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা, রৌদ্র-জল সহ্য ক'রে পাহাড়ের মতন অচল, অটল, নির্ব্বিকার হ'য়ে ভালোবাসার জিনিষটিকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাক্‌তে পারে, তা'কেই ভালোবাসার পরীক্ষায় পাশ হওয়া বলে!"

দৃঢ়-গম্ভীর কণ্ঠে অলোক বলিল—"আর, যদি মানুষের দৃষ্টির অগোচরে মাটির তলে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প সেই পাহাড়ের ভিত্

শুদ্ধ উপ্‌ড়ে ফেলে, সব ভেঙ্গে-চুরে গুঁড়িয়ে তা'কে দূরে নিক্ষেপ ক'রে দেয়, তবে সে-ভালোবাসা পরীক্ষায় ফেল্ হওয়া, না বিজয়?"

অলোকের কণ্ঠ-স্বরে এবং কথার ভঙ্গীতে বিজয় একটু থতমত খাইয়া গেল। সে বলিল—"এই দু'টো দিনের মধ্যে কি-ভূমিকম্প তোমায় এমন ক'রে নাড়া দিয়েছে, তা' তো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না ভাই!"

অলোক পকেট হইতে তাহার পিতায় ডায়েরীখানা বাহির করিয়া বিজয়ের সম্মুখে টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—"এইখানা ভালো ক'রে পড়ো, বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

বিজয় উৎসুক আগ্রহে খাতাখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল, আর অলোক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পড়া শেষ হইলে খাতাখানা বন্ধ করিয়া বিজয় বলিল—"কী আশ্চর্য্য ভাই অলোক! মানুষের জীবনের কোথায় কি লুকোনো আছে, কে, ব'লতে পারে! এই খাতাখানি যদি না পাওয়া যেতো, তা'-হ'লে কা'র জীবন-ধারা কোন্ পথে চ'লতো, কে জানে! কিন্তু পাজী মানদা-মাগী বরাবরই নীরজাকে তা'র নিজের মেয়ে ব'লে পরিচয় দিয়েছে!"

অলোক বলিল—"তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, নিজের মেয়ে ব'লে পরিচয় না দিলে কি এতদিন ধ'রে অতোখানি অত্যাচার বেচারীর ওপর সে ক'রতে পারে!"

বিজয় বলিল—"আচ্ছা, যা' হ'য়ে গেছে তা'র তো চারা নেই, এখন মাগী কি করে, দেখ্‌বো। তোমার কিন্তু উচিত আজই গিয়ে নীরজাকে সব কথা বলা।"

অলোক বলিল—"না, সে এখন থাক্! আমি এখন কিছু-দিনের মতন দূরে চ'লে গিয়ে, এই ক'টা মাস আমার জীবন থেকে উপ্‌ড়ে ফেলে বিস্মৃতির অন্ধ গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাই, ক'লকাতায় থাক্‌লে তা' হবে না। তা'রপর ফিরে এসে নীরজাকে সব কথা ব'লে আবার নতুন ক'রে জীবনটাকে আরম্ভ ক'রবো।"

বিজয় একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"কিন্তু নীরজাকে কিছু না ব'লে তোমার হঠাৎ চ'লে যাওয়াটা কি ভালো হবে? সে যদি আমায় তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে?"

অলোক বলিল—"বোলো আমি হঠাৎ ক'লকাতা ছেড়ে চ'লে গেছি, কবে ফির্‌বো ঠিক নেই!"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিজয় বলিল—"যদি আর-কোনো কথা ওঠে?"

অলোক অবিচলিত-কণ্ঠে বলিল—"বোলো, সব ভুল! এই ক'টা মাসের স্মৃতিকে একটা নিদ্রা-বিরল রাত্রির স্বপ্নের মতনই যেন সে ভুলে যায়, দিনের বাস্তব জীবনের মধ্যে যেন সে তা'র জের না টেনে আনে!"

বিজয় বলিল—"তবু যাবার আগে, একটিবারও তা'র সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না!"

অলোক বলিল—"না, দিন-কতকের মতন আমি সম্পূর্ণভাবে দূরে থাক্‌তে চাই, তা'র কোনো কথা আমায় বোলো না!"

বিজয় তবু বলিল—"তা'কে কিছু না ব'লে চ'লে যাওয়াটা কি ভালো হ'চ্ছে অলোক?"

অলোক দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল—"ভালো হচ্ছে, কি, মন্দ হচ্ছে—তা' জানি না। অতো ভালো-মন্দর ধার আমি ধারি না! আমার মন ব'লছে এই ক'রতে, তাই ক'রছি!"

ইহার পর বিজয় আর কি বলিবে! সে জানিত যে, এই একগুঁয়ে একরোখা মানুষটাকে তাহার নিজের মতের বিপরীত দিকে কেহ কোনোদিন একতিল টলাইতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল—এ কী দুর্জ্ঞেয় বিধান! যেখানে মানুষ কত-না যত্নে, কত-না আশায় তাহার জীবনের খেলা-ঘরখানি সবেমাত্র

পাতিয়া বসিতেছে, তখন কোন-এক অলক্ষ্য পাষাণের নিদারুণ আঘাতে তাহার সে সুখ-স্বপ্ন কেন এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়! আশার কুসুম ঝরিয়াই যদি যাইবে, তবে শুধু একটি প্রভাতের জন্য এমন করিয়া গন্ধে-বরণে কেন সে ফুটিয়া ওঠে!

অলোক উঠিয়া আসিয়া বিজয়ের কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া বিদায়-ব্যথিত-কণ্ঠে বলিল—"তা'-হ'লে দিন-কতকের মতন চ'ললুম্ ভাই বিজয়! আজই সন্ধ্যার মেলে আমি রওনা হ'চ্ছি!"

বিজয় বলিল—"কোথায় যাচ্ছো?"

অলোক বলিল—"কোথায় যাবো, কতদিন থাকৃবো, কিছুই জানি না! তবে উপস্থিত বিন্ধ্যাচল যাচ্ছি, যদি ভালো লাগে, দিন-পনের সেখানে থাকৃতে পারি। তুমি যদি চিঠি লেখো, পোষ্ট্-মাষ্টারের কেয়ারে লিখো, তা'-হ'লেই আমি পাবো।"

আর-কিছু না বলিয়া অলোক চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল। কয়েক-পা গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, আর-একটা কথা—নীরজাকে তোমার কাছে রেখে গেলুম। যে-ভালোবাসার কথা ব'লছিলে, তেম্নি ক'রে যদি তা'কে

কখনও ভালোবাস্‌তে পারো, বেসো। না-হ'লে তা'কে নিয়ে খেলা কোরো না, তা'তে নিজেই ঠ'কবে!"

অলোক চলিয়া গেল। বিজয় হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল।

১১

আজ এগারো-দিন হইল নীরজার জ্বর হইয়াছে। প্রথম যেদিন তাহার জ্বর ফুটিয়া উঠিল, সেদিন বিজয় কিছুই চিন্তিত হয় নাই। কিন্তু সে-জ্বর না কমিয়া দিনের-পর-দিন দ্রুতবেগে বাড়িয়াই চলিল। শেষে যখন ডাক্তার চিন্তিত-মুখে মত দিলেন লক্ষণ ভালো নয়, বুকের অবস্থা খুব খারাপ, তখন বিজয়ের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে একেলা, অলোক সেই-যে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তা'রপর আজ পর্য্যন্ত একখানাও চিঠি লিখিয়া জানায় নাই সে কোথায় ও কেমন আছে।

বিজয় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া নীরজার রোগ-শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া অক্লান্ত সেবা করিতে লাগিল—তাহারই হাতে-যে অলোক নীরজার ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছে! যে-বিজয় সেই-একদিন নীরজার যৌবনোচ্ছ্বসিত দেহের পরিপূর্ণ সুধা পান করিতে মদের

বোতল হাতে এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, আজ সে কোথায়! আজ ওই-যে এক সেবা-পরায়ণ তরুণ গম্ভীর-মুখে নিঃশব্দ সেবার মধ্যে তন্ময় হইয়া আছে, আজ উহার ওই শুষ্ক-ম্লান প্রাণের মধ্যে কি ঢেউ খেলিতেছে কে জানে!

আজ সকাল হইতে নীরজা মধ্যে-মধ্যে অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছে। মুখ তাহার স্ফীত, চক্ষু রক্তবর্ণ—বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়াছে! দুপুর-বেলা তন্দ্রার ঘোরে সে চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে উত্তপ্ত ললাটে একখানি স্নেহ-কোমল হস্তের স্নিগ্ধ-শীতল পরশ যেন তাহার রোগ-কাতর শরীরের সব জ্বালা জুড়াইয়া দিল। চোখ চাহিয়া দেখিল, বিজয় তাহার পাশে বসিয়া ধীরে-ধীরে অতি সন্তর্পণে কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছে। মুহূর্ত্ত-কাল বিজয়ের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের পানে সকরুণ-দৃষ্টিতে নীরজা চাহিয়া রহিল। তা'রপর শীর্ণ-হাতখানি বিজয়ের কোলের উপরে রাখিয়া বলিল—"আপনাকে আমার বড্ড ভয় ক'রতো বিজয়বাবু! খালি মনে হ'তো আপনি আমার গায়ে হাত দেবেন। কিন্তু এখন আর আমার কোনো ভয় নেই। আপনি কেন গোড়া থেকে আমায় এমন ক'রে ভালোবাসেননি?"

বিজয় বলিল—"মানুষের সব শক্তির বাইরে যে বড় শক্তি মানুষের জীবনটাকে ভাঙ্‌ছে,-গ'ড়ছে, সে আমায় ভালোবাস্‌তে যে দেয়নি ভাই !"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নীরজা বলিল—"তিনি আর আস্‌বেন্‌ না, না বিজয়বাবু ?"

বিজয় বলিল—"আস্‌বে বৈ-কি নীরা ! ক'দিন সে একটা কাজে বড় ব্যস্ত ছিল, তাই আস্‌তে পারেনি ; আমি তা'কে খবর দিয়েছি, সে আস্‌বে ।"

নীরজা বলিল—"কবে আস্‌বেন ?"

বিজয় মহা-সমস্যায় পড়িল। কবে-যে অলোক আসিবে, সে আদৌ আসিবে কি না, তাহা-যে সে নিজেই জানে না ! অথচ এই ব্যথাহতা নারীর উন্মুখ হৃদয়টাকে নৈরাশ্যের নিদারুণ আঘাত হইতে যে বাঁচাইতেই হইবে ! বিজয় মনে-মনে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই আস্‌বে নীরা, আজই আস্‌তে পারে !"

নীরজা একটা ব্যথিত-ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"কেন আমায় মিথ্যা বোঝাবার চেষ্টা ক'রছেন ! না বিজয়বাবু, আপনার পায়ে ধ'রছি, তাঁ'কে আপনি আস্‌তে ব'লবেন না। তাঁ'র

না-আসা তবু সহ্য ক'রতে পার্‌বো, কিন্তু আসা কিছুতেই সহ্য ক'রতে পার্‌বো না!"

বিজয় চুপ করিয়া রহিল। কেন-যে অলোক আসিতেছে না, কি-ঝঞ্ঝা যে তাহার বিক্ষুব্ধ অন্তরের মধ্যে প্রলয়-মূর্ত্তিতে বহিতেছে, কি-কারণে যে সে নীরজাকে ছাড়িয়া এমন করিয়া অকস্মাৎ উধাও হইয়া গেল,—সে-সব কথা যদি নীরজা জানিত!

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরজা বলিল—"বিজয়বাবু, আমি ম'রে গেলে তাঁ'কে ব'লবেন যে, তাঁ'কে ভালোবেসে, শেষ নিশ্বাসেও তাঁ'র অনন্ত কল্যাণ কামনা ক'রে আমি ম'রেছি!

উত্তেজনার আতিশয্যে নীরজার শরীরটা থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, নিশ্বাস দ্রুত বহিতে লাগিল। বিজয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া শিশি হইতে একদাগ ঔষধ ঢালিয়া নীরজার মুখের কাছে ধরিল। নীরজা হাত দিয়া ঔষধের গেলাস্‌টাকে সরাইয়া দিয়া বলিল—"বিজয়বাবু, কেন মিছে চেষ্টা ক'রছেন! সব রোগ কি ডাক্তারের ওষুধে সারে!"

বিজয় স্নেহ-বিগলিত-কণ্ঠে বলিল—"সারে না জানি, কিন্তু আমাদের মনে একটা আপ্‌শোষ কেন রেখে যাচ্ছো ভাই, এটুকু খেয়ে ফ্যালো।"

নীরজা আর কিছু না বলিয়া, বিজয়ের হাত হইতে ঔষধটা লইয়া খাইয়া পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিয়া শুইল।

* * * * *

বিকালের দিকে নীরজার পূর্ণ বিকার দেখা দিল,—সে মাঝে-মাঝে অকারণে উঠিয়া বসিতে লাগিল, আপন-মনে যা'-তা' বকিতে লাগিল, থাকিয়া-থাকিয়া হাত-ছানি দিয়া কাহাকে ডাকিতে লাগিল। বিজয় বিষণ্ণ-মনে নীরজার শীর্ণ-পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। অলোককে সে নীরজার অসুখের সংবাদ দিয়াছে, কাল তার করিয়া শীঘ্র চলিয়া আসিতে লিখিয়াছে, তবু কেন সে এখনও আসিল না!

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দিকে-দিকে শাঁখ বাজিয়া উঠিল, দুয়ারে-দুয়ারে গঙ্গা-জলের ছিটা পড়িতে লাগিল, ঘরে-ঘরে রাত্রির উৎসবের আয়োজন সুরু হইয়া গেল। বিজয় তেমনই ভাবে উদাস-নয়নে বসিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল—নীরজার এই রাত্রি প্রভাত হইবে কি!......

* * * * *

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। ধীরে—অতিধীরে—কেমন-যেন-একটা অস্পষ্ট কালো ছায়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল!

বিজয় একই ভাবে নীরজার পাশে বসিয়া রহিল ; সে বেশ বুঝিল প্রদীপের তেল নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।......

সহসা তাহাকে চমকিত করিয়া উন্মাদের মত শূন্য-দৃষ্টিতে অলোক প্রবেশ করিল। তাহার পায়ের শব্দে নীরজা চোখ চাহিয়া দেখিল।

মুহূর্ত্তকাল অভিভূতের ন্যায় অলোকের শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষিপ্রবেগে উঠিয়া বসিয়া নীরজা আর্ত্ত-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কে !—কে !—কে ও !"

বিজয় নীরজাকে ধরিয়া আস্তে-আস্তে বিছানায় শোয়াইয়া বলিল—"ও-যে অলোক নীরা, চিন্‌তে পার্‌ছো না ?"

নীরজা বলিল—"ও—তিনি ! আমি মনে ক'রেছিলুম সুলোচনা !"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া নীরজা হাঁফাইতে লাগিল। বিজয় পাখাখানা লইয়া তাহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

খানিকপরে অলোকের দিকে চাহিয়া নীরজা বলিল—"সাধ মিটে গ্যাছে ? এত শীগ্‌গীর্‌ ভোগের পাত্র খালি হ'য়ে গেল !

তবে কেন আবার এসেছ, আমার যা' ছিল সবই তো দিয়েছি, আর তো......"

বিজয় বলিল—"চুপ করো নীরা, একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো।"

নীরজা বলিল—"হ্যাঁ বিজয়বাবু, এতদিন ঘুমোতে পারিনি' এইবার ঘুমোবো।"

নীরজা পাশ ফিরিয়া শুইল।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা নীরজা হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া বড়-বড় অশ্রুর ফোঁটা বালিসের উপরে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে আপন-মনে বলিতে লাগিল—"বাছা আমার কোল্ খালি ক'রে চ'লে গেল! চার-আনা পয়সার জন্যে তা'কে ওষুধ দিতে পার্‌লুম না!"

বিজয় বলিল—"সে তো তোমার ছেলে নয় নীরা!"

পাগলের মত শূন্য-দৃষ্টিতে বিজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া নীরজা জিজ্ঞাসা করিল—"কা'র ছেলে?"

বিজয় বলিল—"সুলোচনার।"

নীরজা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তা'রপর হঠাৎ অলোকের ডান্-হাতখানা দুই-হাতে ধরিয়া কাতর-কণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁগা, কেন তা'কে অমন্ ক'রে তাড়িয়ে দিলে? তা'র সবই তো

নিয়েছিলে, চরম দুঃখের দিনে তা'কে চারটে আনা পয়সা ভিক্ষে দিতে হাত উঠলো না!"

অলোক জিজ্ঞাসু-নয়নে বিজয়ের মুখের দিকে চাহিল। সুলোচনার কাহিনী তো সে কিছুই জানে না, তাই নীরজা কি বলিতেছে, সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। বিজয় অলোকের হাত ধরিয়া টানিয়া বারান্দায় আনিয়া সুলোচনার ইতিহাস সব বলিল।

যখন সব শুনিয়া অলোক বিজয়ের সহিত ঘরে পুনরায় প্রবেশ করিল, তখন নীরজা চোখ বুজিয়া নিস্পন্দ-দেহে শুইয়াছিল। তাহারা কোনো শব্দ না করিয়া আস্তে-আস্তে পাশে আসিয়া বসিল।

ঘণ্টা-কয়েক নীরজা নড়িল না, চড়িল না, চুপ করিয়া নিমীলিত-নয়নে শুইয়া রহিল—যেন অঘোরে ঘুমাইতেছে!

* * * * * *

পাঁচটা বাজিল। বাহিরে তখন সুপ্তিমগ্ন আকাশে নিশীথের কালো অন্ধকার অতি ধীরে-ধীরে ফিকে হইয়া আসিতেছে। চতুর্দ্দিক তখনও নীরব-নিস্তব্ধ, কোথাও কোনো সাড়া নাই, শব্দ নাই! সেই বিরাট-গম্ভীর স্তব্ধতার বুক চিরিয়া আহতের আর্ত্ত-

নাদের মত দূরে কোন্-একটা ষ্টীমারের ভোঁ বাজিয়া উঠিল। অলোক ও বিজয় তখনও নিঃশব্দে তন্দ্রাহীন-চক্ষে নীরজার শয্যা-পাশে বসিয়া।

নীরজা চোখ চাহিল। তাহার মুখের উপরে বিকারের আর কোনো ছায়া নাই, চক্ষের দৃষ্টি স্বাভাবিক, দেহ শান্ত-ধীর!

অলোকের হাতখানি টানিয়া আনিয়া নীরজা নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে অপলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, যেন তাহার উপবাসী অধর-দু'টি ভাষাহীন বাণীতে ভিক্ষা মাগিতেছে—একটি বিদায়-চুম্বন!—নীরজার ব্যর্থ জীবনের শেষ পাথেয়!

অলোকের বুকের ভিতরটা শিহরিয়া উঠিল! সে বলিল—"নীরজা, এখন কেমন আছো বোন্?"

অলোকের কথায় নীরজা হাত-দু'টি জোড় করিয়া কাতর-মিনতি-ভরা-কণ্ঠে বলিল—"ওগো, আর একটুখানি অপেক্ষা করো, তা'রপর যা'-ইচ্ছে হয় তা'ই ব'লে আমায় ডেকো!"

অলোকের কোন্ কথা নীরজার বুকে বাজিল, তাহা বিজয় বুঝিল। সে বলিল—"না নীরা, এতদিন তোমরা একটা প্রকাণ্ড ভুলের ভেতর দিয়ে চ'লেছিলে, সত্যিই তোমরা দু'জনে ভাই-বোন্!

মানদা তোমার মা নয়, এই ছাখো তোমার বাবার নিজের হাতে লেখা তোমার ইতিহাস!"

এই বলিয়া অলোকের পিতার ডায়েরীখানা ড্রয়ারের ভিতর হইতে বাহির করিয়া বিজয় নীরজার হাতে দিল। নীরজা পড়িতে লাগিল।

* * * * *

ডায়েরীখানা পড়া শেষ হইলে নীরজা ধীরে-ধীবে নিজের বুকের উপরে রাখিয়া দিয়া, কয়েক-মুহূর্ত্ত চোখ-ছ'টি বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তা'রপর অলোকের দিকে চাহিয়া অতি নম্র-কাতর কণ্ঠে ডাকিল—"দাদা!"

নীরজার বিপর্য্যস্ত চুলগুলি কপালের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া অলোক উত্তর দিল—"কেন বোন্?"

নীরজা বলিল—"এ-কথা কেন এতদিন আমায় বলোনি? তা'-হ'লে তো আমি এমন ক'রে শুখিয়ে যেতুম্ না! আজ-যে আমার বড্ড বাঁচ্‌তে ইচ্ছে ক'রছে!"

অলোক বলিল—"নিশ্চয়ই বাঁচ্‌বে নীরা, আমরা ছ'টি পিতৃ-মাতৃহারা ভাই-বোন্ আবার নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ ক'রবো!"

নীরজা কিছু বলিল না, একটুখানি হাসিল মাত্র। তা'রপর

ছিন্ন-তার

ক্ষীণ হাতখানি অতি কষ্টে উর্দ্ধে আকাশের পানে উঠাইয়া কি-যেন বলিতে চেষ্টা করিল।—কিন্তু বলা আর হইল না, মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিয়া তাহার প্রাণহীন অসাড় হাতখানি দিনান্তের ক্লান্ত আলোর ন্যায় বিছানার উপরে এলাইয়া পড়িল।—কেবল তাহার নিস্পন্দ ঠোঁটের কোণে সেই অশ্রু-চোয়ানো হাসিটুকু ঠিক তেম্‌নি করিয়া ফুটিয়া রহিল—শিশির-সিক্ত ধরণীর 'পরে শরৎ-প্রভাতের ঝরা শেফালির মত !!